দেশ ও মানুষ

৪

বিমলেন্দু ভট্টাচার্য • অণিমা ভট্টাচার্য

ভূগোল

নবম শ্রেণী

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ অনুমোদিত নবম শ্রেণীর
পাঠক্রম অনুসারে লিখিত

দেশ ও মানুষ ৪

ভারতের ভৌগোলিক অঞ্চলসমূহ

বিমলেন্দু ভট্টাচার্য, এম্. এ (কলিকাতা)
বিভাগীয় প্রধান, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
প্রাক্তন অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলিকাতা, আই. আই. টি., খড়গপুর, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়

অনিমা ভট্টাচার্য, এম্. এ (কলিকাতা ও লণ্ডন), বি. টি (কলিকাতা)
অধ্যাপিকা, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
প্রাক্তন অধ্যাপিকা, মতিঝিল কলেজ, আশুতোষ কলেজ, হেস্টিংস ট্রেনিং কলেজ, কলিকাতা

কলিকাতা
অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস
দিল্লী বোম্বাই মাদ্রাজ

সূচীপত্র

ভূমিকা

বিদ্যালয় জীবনের প্রায় শেষ ভাগে কিশোরমন অনেকটা পরিণতি লাভ করে। শিশুবয়স থেকে ভূ-বিজ্ঞান সম্পর্কে সে যে জ্ঞানলাভ করে তার শুরু প্রায় গৃহ পরিবেশ থেকে। এই পারিপার্শ্বিকের পরিধি ক্রমশ বিস্তৃত হয়ে দেশের সব সীমা ছুঁয়ে চলে। বর্তমান পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয় ভারতের আঞ্চলিক ভূগোল। আঞ্চলিক ভূগোলের আলোচ্য বিষয় প্রাকৃতিক, অর্থনীতিক ও মানবিক তথা সাংস্কৃতিক আঙ্গিকে প্রতিফলিত। পশ্চিমবঙ্গের একটি কিশোর বা কিশোরী ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, উদ্ভিদ, ফসল, শিল্পসম্পদ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, ঘরবাড়ি, গ্রাম ও শহর-নগর সম্পর্কে নানা প্রশ্নের উত্তর এই পুস্তকে পাবে। উত্তরে অভ্রভেদী হিমালয় থেকে দক্ষিণে ঊর্মি বিধৌত কন্যাকুমারিকার বর্ণনা ও পশ্চিমে ঊষর মরুপ্রান্তর থেকে পূর্বপার্বতী রাজ্যগুলির আলোচনা তার জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করবে। ভারতের সব অঞ্চলের বর্ণনা এই পুস্তকে না থাকলেও যে নয়টি অঞ্চল এখানে আলোচিত হয়েছে তাতে তার ভারত পরিচয় অনেকটা সম্পূর্ণ হবে। আলোচ্য বিষয়গুলি যথাসম্ভব মানচিত্র ও চিত্রে সমৃদ্ধ করা হল। বইটি লেখার পরিশ্রম সার্থক হলে আনন্দ পাব।

বিমলেন্দু ভট্টাচার্য
অণিমা ভট্টাচার্য

প্রথম অধ্যায়

ভারত-পরিচয়

মানব-সভ্যতা বিকাশের ইতিহাসে ভারতের স্থান বিশেষভাবে চিহ্নিত। যে কয়েকটি দেশে সভ্যতার প্রথম জন্মলাভ ও শ্রীবৃদ্ধি ঘটে ভারত তাদের মধ্যে অন্যতম। অখণ্ড ভারতের সিন্ধু উপত্যকায় (বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত) খৃষ্টপূর্ব ২৬০০ অব্দ নাগাদ একটি উন্নত সভ্যতার সূচনা হয় এবং পরবর্তী এক হাজার বছরের মধ্যে তার প্রভাব দক্ষিণে গুজরাট উপকূল এবং পূর্বে যমুনা অববাহিকা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। ঐ সময়ে ভারতে প্রথম শহর ও নগরের জন্ম হয়। সিন্ধু সভ্যতার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত সিন্ধু তীরবর্তী মহেঞ্জোদারো নগর এবং ইরাবতী তীরে অবস্থিত হরপ্পা নগর। পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্মিত এই সব নগরের স্থপতিশৈলী, রাস্তার সরল বিন্যাস, ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী ইত্যাদির ধ্বংসাবশেষ আজও ঐ প্রাচীন সভ্যতার অত্যন্ত উচ্চ মানের পরিচয় বহন করে। খৃষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দের কাছাকাছি সিন্ধু সভ্যতার পতন ঘটে। কিন্তু তার প্রায় দুই শতাব্দী আগে ভারতে আর্যদের আগমন ঘটেছে। অশ্বারোহী, অর্ধ-যাযাবর, কৃষি ও পশুপালনে অভ্যস্ত আর্যরা নগর-সভ্যতার সঙ্গে খুব পরিচিত ছিল না। তাই সিন্ধু-সভ্যতার অবলুপ্তির পর আরও প্রায় তিন শতাব্দী পর্যন্ত ভারতে শহর বা নগর প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ইতিমধ্যে আর্যরা ক্রমে সুশৃঙ্খল ও সংঘবদ্ধ হয়ে উঠতে থাকে এবং স্থানীয় অধিবাসীদের পরাভূত করে ধীরে ধীরে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়। সংঘবদ্ধ হবার প্রথম ধাপ হিসেবে আর্যরাও নগর প্রতিষ্ঠায় মনোনিবেশ করে। এইভাবে যমুনা-গঙ্গা সমভূমিতে হস্তিনা-পুর, ইন্দ্রপ্রস্থ, মথুরা ইত্যাদি নগর একে একে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। এর পর আর্যরা গঙ্গা উপত্যকা ধরে ক্রমে পূর্ব দিকে ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করে। এছাড়া বিভিন্ন নদী-উপত্যকা অনুসরণ করে দক্ষিণ ভারতেও আর্যদের অনুপ্রবেশ ঘটে। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী নাগাদ, অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধের আমলে পূর্ব ভারতের বঙ্গদেশ ও দক্ষিণ ভারতের মাদুরা অঞ্চল পর্যন্ত নগর-সভ্যতা ছড়িয়ে পড়ে। সিন্ধু সভ্যতার সময় থেকে ভারতের সঙ্গে পশ্চিম এশীয় প্রাচীনতর সুমেরীয় সভ্যতা ও আফ্রিকার নীল পর্যঙ্কে বিকশিত মিশরীয় সভ্যতার বাণিজ্যিক আদান-প্রদান শুরু হয়ে গিয়েছিল। তার যথেষ্ট প্রমাণ আজও পাওয়া যায়। আর্যদের ক্ষমতা সম্প্রসারণের সময় এই বাণিজ্যিক সম্পর্ক কিছুটা হ্রাস পেলেও পরে আবার তা হৃত মর্যাদা ফিরে পায়।

বস্তুত শিল্পনৈপুণ্যে দীর্ঘকাল পৃথিবীতে ভারতের কেউ সমকক্ষ ছিল না। ভারতের রেশম ও কার্পাসবস্ত্র, নানা রকম বিলাসসামগ্রী, বিভিন্ন ধরনের মসলাপাতি এবং সর্বোপরি অঢেল ঐশ্বর্য প্রাচীনকাল থেকে নানা দেশের অধিবাসীদের আকৃষ্ট করে এসেছে। সেই কারণে সভ্যতার প্রথম যুগ থেকে এই সেদিন পর্যন্ত বিদেশীরা উত্তর-পশ্চিমের গিরিপথ ধরে ভারতে পর পর হানা দিয়েছে। দ্বাদশ শতাব্দীতে মুসলমান-দের আগমনের পর থেকে ভারতের রাজনৈতিক এবং সামাজিক চিত্র অনেকটা পরি-বর্তিত হতে আরম্ভ করে। পঞ্চদশ শতাব্দীর শুরুতে ইউরোপীয়দের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক পরিবর্তন নতুন করে সূচিত হয় এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি নাগাদ ভারতে ইংরেজ রাজত্ব সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে ভারতীয় সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাস একটি অবিনশ্বর জাতির পরিচয় বহন করে চলেছে। দীর্ঘ পাঁচ হাজার বছর ব্যাপী তিলে তিলে গড়ে ওঠা সংস্কৃতির ছাপ প্রাচীন মুদ্রা, অলংকার, মূর্তি, মন্দির এবং গুহা ও পাহাড়ের গায়ে উৎকীর্ণ অবস্থায় আজও হারিয়ে যায়নি। দেশের নামেও তারই ইংগিত রয়েছে। সিন্ধু থেকে 'হিন্দ্' বা 'হিন্দুস্থান' এবং কিংবদন্তীয় প্রাচীন রাজা ভরত থেকে 'ভারতবর্ষ' বা 'ভারত' দেশের প্রাচীন ইতিহাসের সাক্ষ্য দেয়।

১৯৪৭ সালের ১৫ই অগস্ট এই ঐতিহাসিক ভারতীয় উপমহাদেশ দ্বিখণ্ডিত হয়ে স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের জন্ম দেয়। ঐদিন দ্বিখণ্ডিত ভারতের দুটি বিচ্ছিন্ন অংশকে নিয়ে পাকিস্তান নামে আর একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুত্থান ঘটে। উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত সিন্ধু প্রদেশ, বালুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং পাঞ্জাবের পশ্চিমার্ধ-কে নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান এবং পূর্বদিকে বঙ্গদেশের পূর্বার্ধ ও আসাম প্রদেশের শ্রীহট্ট জেলার অধিকাংশ স্থান নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান গঠিত হয়। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর পূর্ব পাকিস্তান 'বাংলাদেশ' নামে ভারতীয় উপমহাদেশের তৃতীয় স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

এই ক্রমপরিবর্তিত রাজনৈতিক পটভূমিতে বর্তমান ভারত রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অবস্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিমে পাকিস্তান, উত্তরে আফগানিস্তানের ছোট অংশ, চীন, নেপাল, সিকিম এবং ভুটান, ও পূর্বে বাংলাদেশ এবং ব্রহ্মদেশের অবস্থান তিন দিকে ভারতের আন্তর্জাতিক সীমানাকে কোন কোন ক্ষেত্রে বিতর্কের বিষয় করে তুলেছে। বিশেষ করে পাকিস্তান ও চীনের সঙ্গে ভারতের সীমানা নিয়ে মত-বিরোধ আজও শেষ হয়নি। পক্ষান্তরে সাগর-নির্ধারিত দক্ষিণ সীমানা বিরোধহীন এবং স্থায়ী পর্যায়ের (মানচিত্র ১)।

পূর্ব গোলার্ধে ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় মণ্ডলে ৮°৪' থেকে ৩৭°৬' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৬৮°৭' থেকে ৯৭°২৫' পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত এই দেশের মোট আয়তন ৩,১৯২,২৩৩ বর্গ কি এবং এখানকার অধিবাসীর সংখ্যা ৫৪৭,৯৪৯,৮০৯
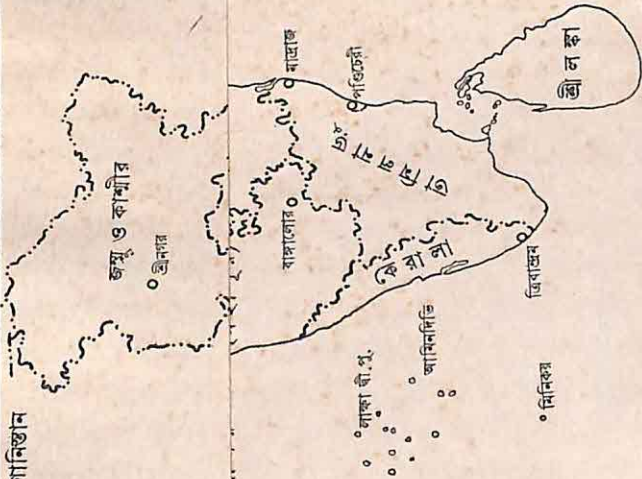
ভারত
রাজনৈতিক মানচিত্র
আফগানিস্তান
জম্মু ও কাশ্মীর
শ্রীনগর
চীন
বাঙ্গালোর
মাদ্রাজ
পণ্ডিচেরী
তামিলনাডু
কেরালা
লাক্ষা দ্বী.পু.
আমিনদিভি
মিনিকয়
ত্রিবান্দ্রম
শ্রীলঙ্কা
আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ
পোর্টব্লেয়ার
নিকোবর দ্বী পু.
আন্তর্জাতিক সীমানা
রাজ্য সীমানা
রাজধানী
ভারত মহাসাগর

মানচিত্র ২

দেওয়া হয়েছে। এই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলে ভারত তার উচ্চ সংস্কৃতির মতো অর্থনীতির ক্ষেত্রেও বিশ্বের অগ্রসর দেশসমূহের পাশে স্থান করে নিতে পারবে।

ভৌগোলিক অঞ্চল

'অঞ্চল' কথাটির সঙ্গে আমরা পরিচিত। 'অঞ্চল' বলতে একটা সীমানা বেষ্টিত এলাকাকে বোঝায়। এখানে সীমানা শব্দটি অর্থপূর্ণ। যে কোন বাড়ির একটি সীমানা থাকে। কিন্তু সীমানাবদ্ধ এই বাড়িটিকে অঞ্চল বলা যায় না। কতগুলি বাড়ির সমষ্টি একটি বসতি। সীমানাবেষ্টিত একটি বসতিকে বসতি অঞ্চল বলা যায়। অনুরূপ ভাবে একক বসতি বা বসতি-সমষ্টিকে গ্রাম বা গ্রামাঞ্চল বলা যায়। বসতি বা গ্রাম ছোট অঞ্চল। সীমানাবেষ্টিত এরকম অনেক ছোট অঞ্চলের দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। যেমন 'বনাঞ্চল', 'কৃষি অঞ্চল', 'জলাভূমি অঞ্চল', 'তৃণাঞ্চল' ইত্যাদি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 'এলাকা' কথাটিই এসব অঞ্চলের পক্ষে অধিক প্রযোজ্য।

এছাড়া প্রচলিত যে সব অঞ্চলের সঙ্গে আমরা পরিচিত তা নানা শ্রেণীর। যেমন রাজনৈতিক অঞ্চল, অর্থনৈতিক অঞ্চল, ভৌগোলিক অঞ্চল ইত্যাদি। প্রশাসনিক সুবিধার জন্য যে সব সীমানাবেষ্টিত অঞ্চল সৃষ্টি করা হয় তাদের রাজনৈতিক অঞ্চল বলে। রাজনৈতিক অঞ্চল বলতে থানা, তহশীল, মহকুমা, জেলা, বিভাগ, রাজ্য, প্রদেশ, রাষ্ট্র, দেশ ইত্যাদি বোঝায়। সম্পদ অঞ্চল, শিল্পাঞ্চল, শক্তি অঞ্চল, সেচ অঞ্চল, পরিকল্পনা অঞ্চল, পরিবহণ অঞ্চল, নগরাঞ্চল, বন্দরের পশ্চাৎ প্রদেশ ইত্যাদি অর্থনৈতিক অঞ্চল। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বিভিন্ন সম্পদ ও ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন, বন্টন ও বাণিজ্যের সুবিধার জন্য একটি দেশ বা রাজ্যকে যে সব ক্ষুদ্র বৃহৎ এলাকায় ভাগ করা হয় তাদের অর্থনৈতিক অঞ্চল বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ বাংলা-বিহার-ওড়িশার খনিজ সম্পদ অঞ্চল; মহীশূর, মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের খনিজ সম্পদ অঞ্চল; উত্তর ভারতের চা-বাগিচা অঞ্চল; নিম্ন-হুগলী শিল্পাঞ্চল; বোম্বাই শিল্পাঞ্চল; আসানসোল-দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল; ময়ূরাক্ষী, কংসাবতী সেচ-অঞ্চল (পশ্চিমবঙ্গ); গঙ্গা-যমুনা সেচ অঞ্চল (উত্তরপ্রদেশ); দামোদর উপত্যকা-পরিকল্পনা অঞ্চল; কলিকাতা-মহানগরী উন্নয়ন পরিকল্পনা অঞ্চল; দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা অঞ্চল; পূর্ব, মধ্য ও পশ্চিম হিমালয় শক্তি অঞ্চল; আসাম-গোদাবরী শক্তি অঞ্চল; পূর্বঘাট শক্তি অঞ্চল; দক্ষিণ পশ্চিমঘাট শক্তি অঞ্চল; পূর্ব রেল, দক্ষিণপূর্ব রেল, দক্ষিণ রেল, পশ্চিম রেল ইত্যাদি পরিবহণ অঞ্চল; কলকাতা-হাওড়া নগরাঞ্চল; বোম্বাই-কল্যাণ নগরাঞ্চল ইত্যাদি; কলকাতা, বোম্বাই, ও মাদ্রাজ ইত্যাদি বন্দরের পশ্চাৎপ্রদেশ অঞ্চল।

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অঞ্চলের সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে সাদৃশ্য থাকলেও ভৌগোলিক অঞ্চল একটু স্বতন্ত্র। অতি সাধারণ ভৌগোলিক অঞ্চল বলতে পার্বত্য অঞ্চল, মাল-

ভূমি অঞ্চল, মরু অঞ্চল, তুন্দ্রা অঞ্চল, নিরক্ষীয় অরণ্য অঞ্চল, প্রেয়ারি অঞ্চল, তাইগা অঞ্চল, কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চল ইত্যাদি বোঝায়।

এখানে প্রতিটি অঞ্চলের সীমারেখা যে কোন একটি প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। যেমন পার্বত্য অঞ্চল বলতে সুউচ্চ বন্ধুর ভূভাগ বোঝায়। অনুরূপ-ভাবে মালভূমি একটি অনুচ্চ বন্ধুর ভূভাগ যা সমভূমি থেকে পৃথক।

মরু অঞ্চল ও তুন্দ্রা অঞ্চল জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য ইংগিত করে। এখানে বন্ধুরতার প্রশ্ন অনুপস্থিত। বৃষ্টিবিরল বা বৃষ্টিহীন শুষ্ক অঞ্চলকে মরু অঞ্চল বলা হয়। তুন্দ্রা অঞ্চল বলতে অতিশীতল বৃক্ষহীন অঞ্চলকে বোঝায়। এখানে শীতকাল দীর্ঘ ও গ্রীষ্মকাল হ্রস্ব। অতিরিক্ত শীতলতায় বৎসরের অধিকাংশ সময় এই অঞ্চল তুষারাবৃত থাকে।

নিরক্ষীয় অরণ্য অঞ্চল, প্রেয়ারি অঞ্চল ও তাইগা অঞ্চল স্বাভাবিক উদ্ভিদ অঞ্চলকে বোঝায়। বিষুব অঞ্চলে সারা বছর বৃষ্টিপাত ও প্রখর উত্তাপের ফলে গভীর অরণ্যের সৃষ্টি হয়। এখানকার বৃক্ষের দৈর্ঘ্য ও বৈচিত্র্য সন্নিহিত অঞ্চল থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। অতএব এই অরণ্যের সীমানা নিরক্ষীয় অঞ্চলের সৃষ্টি করেছে। একই ভাবে উত্তর আমেরিকার রকি পর্বতের পূর্বভাগে প্রেয়ারি অঞ্চল––স্বল্প বৃষ্টিপাতের জন্য বিস্তীর্ণ তৃণভূমি। সাইবেরিয়ার শীতল ও নাতিবৃষ্টি অঞ্চলের সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্যকে তাইগা অঞ্চল বলে। এই অরণ্যের বৃক্ষের বৈশিষ্ট্য এই যে শীতকালের তুষারপাত ও স্বল্প বৃষ্টিপাত এরা সহ্য করতে পারে।

ভারতের পশ্চিমে গুজরাট, মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশে কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চল বর্তমান। মৃত্তিকার বর্ণানুসারে এই অঞ্চলের নামকরণ করা হয়েছে। স্থানীয় লাভাশিলা থেকে উদ্ভূত হওয়ায় এই কৃষ্ণমৃত্তিকা কৃষ্ণবর্ণ।

এইভাবে বন্ধুরতা, জলবায়ু, স্বাভাবিক উদ্ভিদ ও মৃত্তিকার ভিত্তিতে যে সব অঞ্চল নির্দিষ্ট করা হয় তা 'সাধারণ' বা 'প্রাথমিক ভৌগোলিক অঞ্চল'।

কিন্তু প্রকৃত ভৌগোলিক অঞ্চল অনেক জটিল শ্রেণীর। প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য সেখানে অন্যতম প্রধান উপাদান হলেও অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য এসব ক্ষেত্রে বিবেচ্য। যেমন পৃথিবীর মৌসুমী অঞ্চল––দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহ, অস্ট্রেলিয়ার উত্তরপূর্বাংশ, উত্তর আমেরিকার দক্ষিণপূর্বাংশ, ক্রান্তীয় পূর্ব আফ্রিকা, গিনিউপকূলীয় পশ্চিম আফ্রিকা প্রভৃতি––বিচ্ছিন্ন অঞ্চল হলেও এসব জায়গায় জল-বায়ুগত সাদৃশ্য ও উৎপন্ন দ্রব্যের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। মৌসুমী অঞ্চল গ্রীষ্মকালীন বৃষ্টিপাত ও শুষ্ক শীতকালের জন্য সুপরিচিত। তেমনি এসব অঞ্চলের প্রধান প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য––ধান, ইক্ষু, তুলো প্রভৃতি।

একই ভাবে পৃথিবীর মরু অঞ্চল সর্বত্র শুষ্ক, রুক্ষ, প্রায় জলশূন্য, বৃক্ষহীন, কাঁটাগাছ ও রুক্ষ ঘাসে পূর্ণ। সব মরু অঞ্চলের অধিবাসীরাই খাদ্যের জন্য জীবজন্তুর উপর

নির্ভরশীল। কৃষিকার্য সেখানে গৌণ। আধুনিক কালে অবশ্য সেখানে খনিজ সম্পদের সদ্ব্যবহার হতে দেখা যায়। বিভিন্ন মরু অঞ্চলের প্রাকৃতিক সাদৃশ্য ও মানুষের জীবনযাত্রার সাদৃশ্য গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য।

পূর্ব ব্যাখ্যার ভিত্তিতে ভৌগোলিক অঞ্চল বলতে প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক ও মানবিক সাদৃশ্যমণ্ডিত অঞ্চল সমূহকে বোঝায়। অর্থাৎ সীমানাবেষ্টিত ভৌগোলিক অঞ্চলের বন্ধুরতা, জলবায়ু, স্বাভাবিক উদ্ভিদ, প্রাকৃতিক সম্পদ, মনুষ্য উপজীবিকা ও মানবসভ্যতা প্রায় সদৃশ। প্রতিটি ভৌগোলিক অঞ্চল পারিপার্শ্বিক অঞ্চল থেকে পৃথক। এই বৈসাদৃশ্য প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক উপাদানের উপর নির্ভর করে। মানুষের খাদ্যাভ্যাস, বেশভূষা ও ভাষাও এরকম বৈসাদৃশ্যের সূত্র হতে পারে। ক্রমবর্ধমান দূরত্ব, ভৌগোলিক অঞ্চলসমূহের বৈসাদৃশ্য বর্ধিত করে।

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অঞ্চলের সঙ্গে ভৌগোলিক অঞ্চলের অনেক সাদৃশ্য থাকলেও ভৌগোলিক অঞ্চল নির্ধারণে প্রশাসনিক বা অর্থনৈতিক গুরুত্ব উপেক্ষিত হতে পারে।

ভারতে ভৌগোলিক অঞ্চলের চর্চা খুব বেশি দিনের নয়। তথাপি ভৌগোলিক অঞ্চলের ধারণা ভারতীয়দের ছিল না একথা বলা যায় না। বহুদিন আগে ভারতবাসী আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্য এই দুই প্রধান অঞ্চলে ভারতবর্ষকে ভাগ করে। ঐতিহাসিক যুগে অঞ্চলজ্ঞানের বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন অঙ্গরাজ্য, কলিঙ্গদেশ, কর্ণাটক রাজ্য, মালোয়া রাজ্য, গান্ধার রাজ্য প্রভৃতি।

উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতকে যেসব ভৌগোলিক অঞ্চলে ভাগ করা হয় তা প্রধানত জলবায়ুভিত্তিক। জলবায়ুভিত্তিক এই সব অঞ্চলের সঙ্গে রাজনৈতিক অঞ্চলের সাদৃশ্য ছিল। প্রখ্যাত ভৌগোলিক ডাড্‌লি স্ট্যাম্প ১৯২৯ সালে সম্পূর্ণ নতুন ভাবে ভারতকে ভৌগোলিক অঞ্চলে ভাগ করেন। পরবর্তীকালে ও. এইচ. কে. স্পেট আরও বিস্তারিত ভাবে বিভিন্ন পর্যায়ের ভৌগোলিক অঞ্চলে ভারতকে বিভক্ত করেন। স্ট্যাম্প ও স্পেটের আঞ্চলিক বিভাগের পর আর. এল. সিং পুনরায় ভারতকে বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে ভাগ করেন।

ভূপ্রকৃতি অনুসারে আর. এল. সিং ভারতকে প্রধানত চারটি ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন, দক্ষিণের মালভূমি, হিমালয় পার্বত্যাঞ্চল, মালভূমি ও পার্বত্যাঞ্চলের মধ্যবর্তী মহা-সমভূমি, এবং উপকূলীয় সমভূমি ও দ্বীপপুঞ্জসমূহ।

প্রাথমিক এই চারটি বৃহৎ অঞ্চলকে ২৮টি মাধ্যমিক বিভাগে ভাগ করা হয়েছে (মানচিত্র ৩)। যেমন:

দক্ষিণের মালভূমি অঞ্চল

১। উদয়পুর-গোয়ালিয়র অঞ্চল
২। মালোয়া অঞ্চল
৮। ছত্রিশগড় অঞ্চল
৯। ওড়িশা উচ্চভূমি অঞ্চল

ভারত
ভৌগোলিক অঞ্চল
কাশ্মীর অঞ্চল
মালভূমি
কর্ণাটক মালভূমি
সাগর
বঙ্গোপসাগর
তামিলনাড়ু উচ্চভূমি
দক্ষিণ সহ্যাদ্রি
লাক্ষা দ্বী. পু.
আমিনদিভি
মিনিকয়
শ্রীলঙ্কা
আন্দামান দ্বী. পু.
নিকোবর দ্বী পু
ভারত মহাসাগর
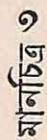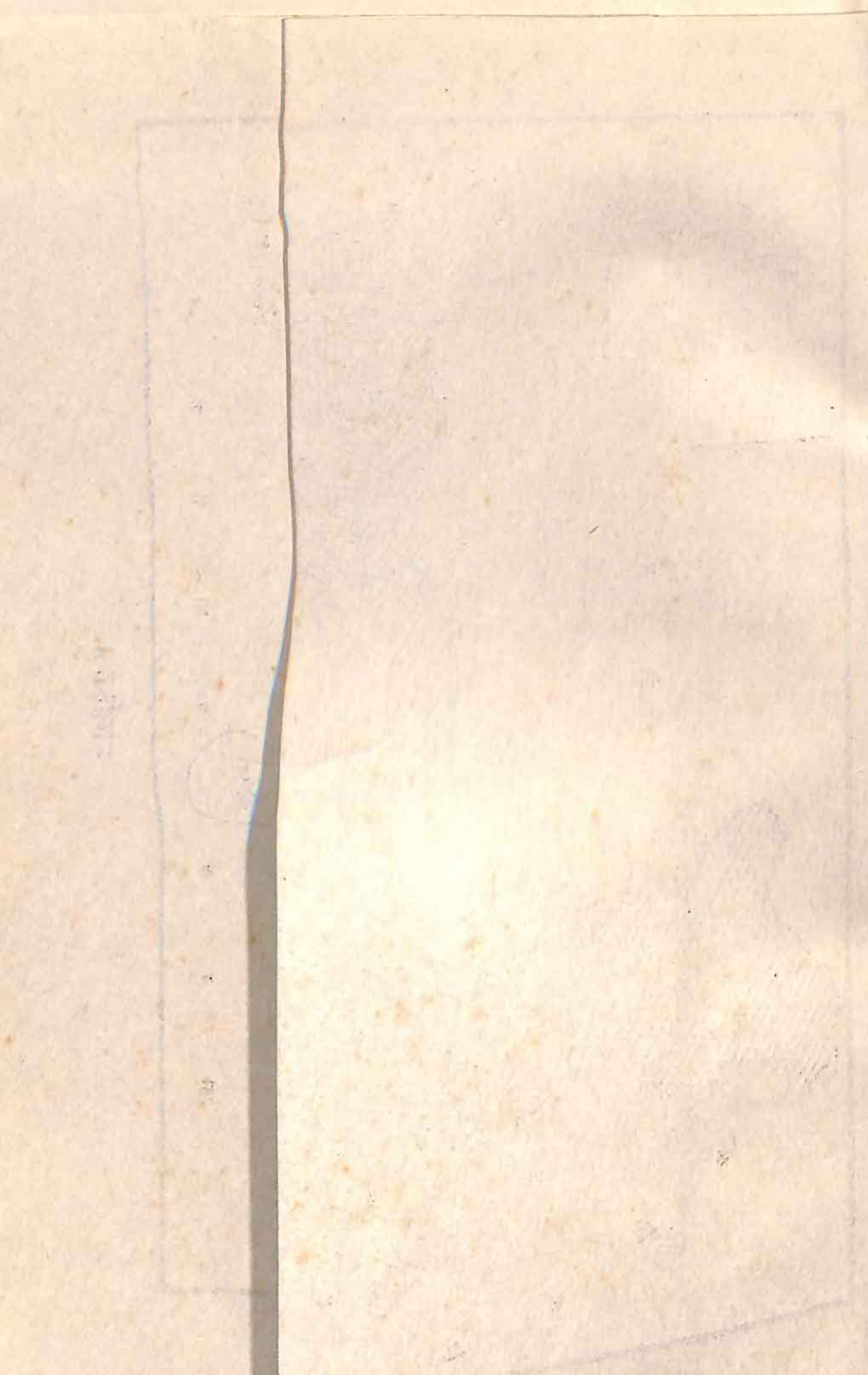
মানচিত্র ৩

৩। বুন্দেলখণ্ড অঞ্চল
৪। বিন্ধ্যাচল-বাঘেলখণ্ড অঞ্চল
৫। ছোটনাগপুর অঞ্চল
৬। মেঘালয়-মিকির অঞ্চল
৭। মহারাষ্ট্র অঞ্চল
১০। দণ্ডকারণ্য অঞ্চল
১১। কর্ণাটক মালভূমি
১২। অন্ধ্র মালভূমি
১৩। তামিলনাড়ু উচ্চভূমি ও দক্ষিণ সহ্যাদ্রি

হিমালয় পার্বত্যাঞ্চল ও পার্বত্য পূর্বাঞ্চল

১৪। কাশ্মীর অঞ্চল
১৫। হিমালয় অঞ্চল
১৬। উত্তরপ্রদেশ-হিমালয়
১৭। পূর্ব হিমালয়
১৮। পূর্বাঞ্চল হিমালয় বা পার্বত্য পূর্বাঞ্চল।

মহা-সমভূমি অঞ্চল

১৯। রাজস্থান সমভূমি
২০। পাঞ্জাব সমভূমি
২১। উচ্চ-গঙ্গা সমভূমি
২২। মধ্য-গঙ্গা সমভূমি
২৩। নিম্ন-গঙ্গা সমভূমি
২৪। আসাম উপত্যকা

উপকূলীয় সমভূমি ও দ্বীপপুঞ্জ

২৫। গুজরাট অঞ্চল
২৬। পশ্চিম উপকূল অঞ্চল
২৭। পূর্ব উপকূল অঞ্চল
২৮। ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ।

এই ২৮টি মাধ্যমিক অঞ্চলকে প্রথম পর্যায়ে ৬৭টি বিভাগে ও দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৯২টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এতগুলি অঞ্চলের পরিচয় দেওয়া এখানে সম্ভব নয়। তবে এ থেকে ধারণা করা যায় যে বিজ্ঞানসম্মত ভৌগোলিক অঞ্চল ছোট আকারের হতে পারে।

এই বইয়ে আলোচ্য অঞ্চলগুলি ভারতের চারটি প্রাথমিক বা প্রধান অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

উত্তর ও পূর্বের পার্বত্যাঞ্চল : (ক) হিমালয়
(খ) উত্তর-পূর্বের পার্বত্য রাজ্য

মহা-সমভূমি অঞ্চল : (গ) গাঙ্গেয় সমভূমি
(ঘ) ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা
(ঙ) মরুস্থলী

দক্ষিণের মালভূমি অঞ্চল : (চ) দাক্ষিণাত্যের মালভূমি : (১) লাভা অঞ্চল,
(২) মহীশূর মালভূমি,
(৩) ছোটনাগপুর মালভূমি।
(ছ) কচ্ছ ও কাথিয়াবাড়
(এই অঞ্চলের সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চল উপকূলীয় সমভূমির অন্তর্গত)।

উপকূলীয় সমভূমি : (জ) পূর্ব উপকূলীয় সমভূমি
(ঝ) পশ্চিম উপকূলীয় সমভূমি। (মানচিত্র—৪)

দ্বিতীয় অধ্যায়

হিমালয়

ভারতের উত্তরভাগ পর্বতময়। এই পর্বতমালা হিমালয় নামে পরিচিত। সংস্কৃত 'হিম+আলয়', অর্থাৎ 'তুষারাবাস' কথা থেকে হিমালয় নামের উৎপত্তি। হিমালয় পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশ্রেণী। সিন্ধুনদ যেখানে দক্ষিণ দিকে বাঁক নিয়েছে সেখানে আরম্ভ হয়ে ব্রহ্মপুত্রনদের দক্ষিণমুখী বাঁক পর্যন্ত মধ্যবর্তী প্রায় ২২ দ্রাঘিমাংশ-স্থান জুড়ে হিমালয় একটি বৃত্তচাপের আকারে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে প্রসারিত। এই পর্বতমালা ২৪০০ কি দীর্ঘ, ১৫০ থেকে ৪০০ কি প্রশস্ত এবং মোট আয়তন প্রায় ৫০০,০০০ বর্গ কি।

উত্তুঙ্গ হিমালয় ভাঁজ, ভঙ্গিল বা বলিত শ্রেণীর পর্বত। ভূ-আন্দোলনের ফলে এই পর্বত সৃষ্টি হয়েছে। প্রায় চার কোটি বছর আগে হিমালয়ের বর্তমান স্থানটি জুড়ে একটি বিরাট ভূ-অবতলভঙ্গ (geosyncline) ছিল। ইউরোপের পশ্চিম প্রান্ত থেকে এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত এই ভূ-অবতলভঙ্গ ভূবিজ্ঞানীদের কাছে টেথীস (Tethys) নামে পরিচিত। ভূ-অবতলভঙ্গটি আসলে একটি অগভীর অপ্রশস্ত সমুদ্রবিশেষ। এর দুই প্রান্তে ঐ সময়ে যে বিস্তৃত ভূভাগ ছিল ভূবিজ্ঞানীরা তাদের নামকরণ করেছেন যথাক্রমে আঙ্গারাল্যাণ্ড ও গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড। এই দুটি প্রকাণ্ড, কঠিন শিলায় গঠিত ভূভাগ থেকে ক্ষয়িত পদার্থ দীর্ঘকাল ধরে নদী ইত্যাদি দ্বারা বাহিত হয়ে অন্তর্বর্তী সমুদ্র টেথীসে ধীরে ধীরে জমা হতে থাকে। এই সঞ্চিত পদার্থ স্তরে স্তরে জমা হয়ে যেমন টেথীসের গভীরতা কমিয়ে দিতে থাকে তেমনি বিরাট সঞ্চয় সমুদ্রের তলদেশের ওপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করতে আরম্ভ করে। সঞ্চিত পদার্থের ওজন ও প্রবল চাপের ফলে টেথীসের কঠিন শিলাগঠিত তলদেশ ক্রমশ অবনমিত হতে থাকে এবং এই কারণে সঞ্চয় ধারণের ক্ষমতা আরও বেড়ে যায়। সঞ্চয়বৃদ্ধির ফলে ওজন ও চাপ বেড়ে গিয়ে তলদেশের অবনমন সমানে চলতে থাকে। সঞ্চিত পদার্থের গভীরতা, ওজন এবং চাপ অবতলের মধ্যভাগে সবচেয়ে বেশি হওয়াতে অবনমনের মাত্রা ঐ অংশে সর্বাধিক। কিন্তু অবতলের দুই প্রান্তভাগও কঠিন শিলায় গঠিত হওয়ায় অবনমিত মধ্যভাগের প্রচণ্ড টান বা আকর্ষণে ধীরে ধীরে পরস্পরের নিকটবর্তী হতে থাকে। প্রান্তভাগদ্বয়ের পরস্পরের দিকে এইভাবে এগিয়ে যাবার ফলে মধ্যবর্তী স্তরীভূত পদার্থের ওপর দুপাশ থেকে প্রচণ্ড

চাপ পড়ে সংকোচনজনিত ভাঁজের সৃষ্টি হয়। পরবর্তীকালে বিভিন্ন কারণে টেথীসের দক্ষিণে অবস্থিত প্রকাণ্ড ভূভাগ উত্তরাভিমুখে এগিয়ে আসতে থাকে এবং সঞ্চিত স্তরীভূত পদার্থ প্রচণ্ড চাপের মাধ্যমে ভাঁজ পর্বতে রূপান্তরিত হয়। পর্বত গঠনের সময় চাপের প্রবলতায় ভূ-অবতলভঙ্গের তলদেশ ফেটে গিয়ে স্থানে স্থানে ভূত্বকের নিম্নপ্রদেশ থেকে গলিত আগ্নেয়শিলা উৎক্ষিপ্ত হয়ে স্তরীভূত শিলার ভাঁজে ভাঁজে ঢুকে যায়। এছাড়া ঐ চাপের ফলে যে প্রচণ্ড উত্তাপ সৃষ্টি হয় তাতে স্তরীভূত এবং আগ্নেয়শিলা কোথাও কোথাও রূপান্তরিত শিলার জন্ম দেয়। এই পর্বত সৃষ্টি হতে প্রায় দশ লক্ষ বছর লেগেছে। হিমালয়ের গঠন আজও শেষ হয়নি। এখনও তা অত্যন্ত ধীরে ধীরে উঁচু হয়ে চলেছে। বর্তমানে হিমালয়ের যে রূপ আমরা দেখতে পাই তা অবক্ষয়জনিত বন্ধুর। অভ্রভেদী শৃঙ্গ, খাড়া ঢাল, গভীর খাত ভূপ্রকৃতির বন্ধুরতাকে তীব্র করে তুলেছে। তাছাড়া নানারকম স্তরীভূত, আগ্নেয় এবং রূপান্তরিত শিলারাশি দ্বারা গঠিত হওয়াতে নরম এবং কঠিন শিলা বিভিন্নভাবে ক্ষয় হয়ে ভূ-প্রকৃতির বৈচিত্র্যকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। উত্তর ভারতের প্রধান নদীগুলি হিমালয় থেকে জন্মলাভ করেছে এবং এদের মধ্যে সিন্ধু, শতদ্রু, কোশী এবং ব্রহ্মপুত্র পর্বতাঞ্চলে গভীর গিরিখাতের সৃষ্টি করেছে।

মূলত চারটি পরস্পর সমান্তরাল পর্বতশ্রেণী নিয়ে হিমালয় পর্বতমালা গঠিত হলেও তার শাখা-প্রশাখা সংখ্যাতীত। সাধারণভাবে উত্তর থেকে দক্ষিণে পর্বতশ্রেণীর উচ্চতা কমে এসেছে। উত্তর থেকে দক্ষিণে হিমালয়কে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন (১) তিব্বতীয় হিমালয় (এই পর্বতশ্রেণী ভারতের সীমানার বাইরে অবস্থিত); (২) উচ্চ হিমালয় বা হিমাদ্রি; (৩) ক্ষুদ্র হিমালয় বা হিমাচল এবং (৪) বহির্হিমালয় বা শিবালিক (মানচিত্র ৫)।
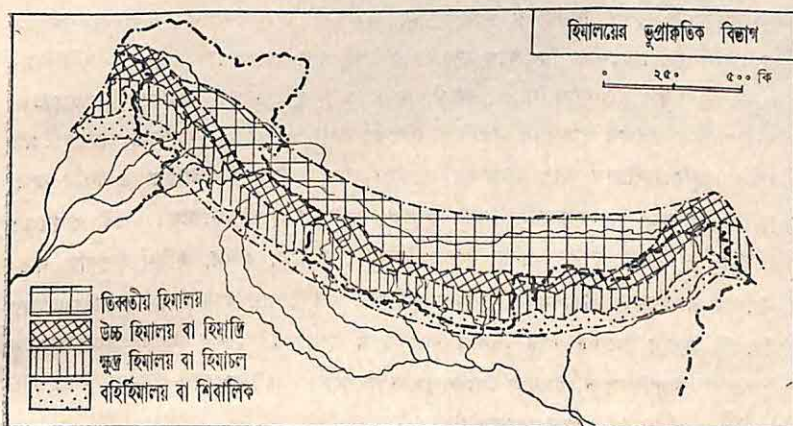
মানচিত্র ৫

(১) তিব্বতীয় হিমালয়: তিব্বতের অন্তর্গত হিমালয়ের এই অংশটি প্রায় ৪০ কি প্রশস্ত এবং এর সর্বোচ্চ উচ্চতা ৫৮০০ মিটার। এই পর্বত প্রধানত স্তরীভূত শিলা দ্বারা গঠিত এবং অত্যন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত। সিন্ধু এবং ব্রহ্মপুত্র এই অঞ্চলে উৎপন্ন হয়ে প্রবাহিত হবার পথে গভীর এবং দীর্ঘ খাতের সৃষ্টি করেছে।

(২) উচ্চ হিমালয় বা হিমাদ্রি: তিব্বতীয় হিমালয়ের অব্যবহিত দক্ষিণে হিমালয় পর্বতমালার উচ্চতম অংশটি অবস্থিত। এর গড় উচ্চতা ৬০০০ মি। পশ্চিমে নাঙ্গা পর্বতশৃঙ্গ (৮১২৬ মি) থেকে শুরু হয়ে পূর্বে অরুণাচলের নামচা বারওয়া (৭৭৫৭ মি) পর্বতশৃঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত এই অবিচ্ছিন্ন শাখা প্রধানত গ্রানিট-জাতীয় আগ্নেয় শিলা, নীস (gniess) জাতীয় রূপান্তরিত শিলা ও স্তরীভূত শিলা দ্বারা গঠিত। হিমাদ্রির পশ্চিমাংশের গড় উচ্চতা পূর্বাংশের চাইতে বেশি। হিমালয়ের অধিকাংশ উচ্চ পর্বতশৃঙ্গগুলি এই শাখায় দেখা যায়। তাদের মধ্যে পূর্বদিকে অবস্থিত মাউন্ট এভারেস্ট (৮৮৪৮ মি), কাঞ্চনজঙ্ঘা (৮৫৯৮ মি), মধ্যভাগে মাকালু (৮৪৮১ মি), ধবলগিরি (৮১৭২ মি), পশ্চিমভাগে নন্দাদেবী (৭৮১৭ মি), নাঙ্গাপর্বত (৮১২৬ মি) বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। উচ্চ হিমালয় এবং পির পাঞ্জাল শাখার মধ্যবর্তী অংশে কাশ্মীর উপত্যকা অবস্থিত।

(৩) ক্ষুদ্র হিমালয় বা হিমাচল: হিমাদ্রির দক্ষিণে হিমাচল পর্বতশ্রেণী ৬০ থেকে ৮০ কি প্রশস্ত এবং এর গড় উচ্চতা ২০০০ থেকে ৩৩০০ মি। হিমালয়ের এই অংশটি অনেকগুলি শাখা প্রশাখায় গঠিত। নাগটিব্বা, ধওলাধর, মহাভারত পাহাড়, মুসৌরী পাহাড় এবং রত্তনপির প্রধান শাখাসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

(৪) বহির্হিমালয় বা শিবালিক: দক্ষিণ দিকে হিমালয়ের সর্বশেষ অংশটি শিবালিক নামে পরিচিত। তারপর থেকে গঙ্গার সমভূমি আরম্ভ হয়েছে। দশ থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার প্রশস্ত শিবালিক পাহাড়শ্রেণী একমাত্র পশ্চিমবঙ্গের তিস্তা ও রায়গঞ্জ নদীর মধ্যবর্তী ৮০-৯০ কি অংশ বাদ দিয়ে সিন্ধু নদী থেকে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন-ভাবে বিস্তৃত। প্রধানত বালি, কর্দম, নুড়ি ও পিণ্ডীভূত নুড়ি (conglomerate) দ্বারা গঠিত এইসব পাহাড়ের সর্বাধিক উচ্চতা কোথাও ১৩০০ মিটারের চাইতে বেশি নয়। ভূবিজ্ঞানীদের মতে হিমালয় গঠনের শেষ পর্যায়ে নদীবাহিত উপাদান জমা হয়ে এবং পরে তা আন্দোলিত হয়ে ভঙ্গিল পাহাড়ের সৃষ্টি করেছে। এই পাহাড়ের শিলারাশির মধ্যে হাতি, গণ্ডার, ঘোড়া, জিরাফ, শুয়োর, বানর, হরিণ ইত্যাদি পশু-কংকালের অনেক জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হওয়াতে এটা প্রমাণ হয়েছে যে মূল হিমালয়ের উৎপত্তি হবার অনেক পরে শিবালিকের জন্ম হয়েছে। কোন কোন স্থানে সমতল উপত্যকা শিবালিককে হিমাচল থেকে পৃথক করেছে। এই ধরনের অবতল উপত্যকার স্থানীয় নাম 'দুন'। যেমন 'দেরাদুন'।

ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য

হিমালয়ের ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে হিমবাহ এবং হ্রদীয় অঞ্চল বিশেষভাবে উল্লেখ্য। হিমরেখা, অর্থাৎ যে রেখার ঊর্ধ্বে তুষার গলে না, পূর্বাংশে ৪৩০০ মি এবং পশ্চিমাংশে ৫৮০০ মি থেকে শুরু হয়েছে। হিমরেখার ঊর্ধ্বাংশে অনেক হিমবাহ দেখা যায়। অধিকাংশ হিমবাহ ৩ থেকে ৫ কিমি দীর্ঘ; কিন্তু কোন কোন হিমবাহ আকারে বিশাল। ঝিলম, গঙ্গোত্রী এবং জেমু হিমবাহ প্রায় ৩০ কিমি দীর্ঘ। হিমবাহগুলি অনেক সময় হিমরেখার নিচে নেমে আসে এবং তখন তাদের বরফগলা জল নদীকে পুষ্ট করে তোলে। হিমবাহের গতিপথে অনবরত ক্ষয়কার্যের ফলে ইংরেজী U-অক্ষরাকৃতি উপত্যকার সৃষ্টি হয় এবং পর্বতগাত্রের দেওয়াল খাড়াভাবে কেটে যায়।
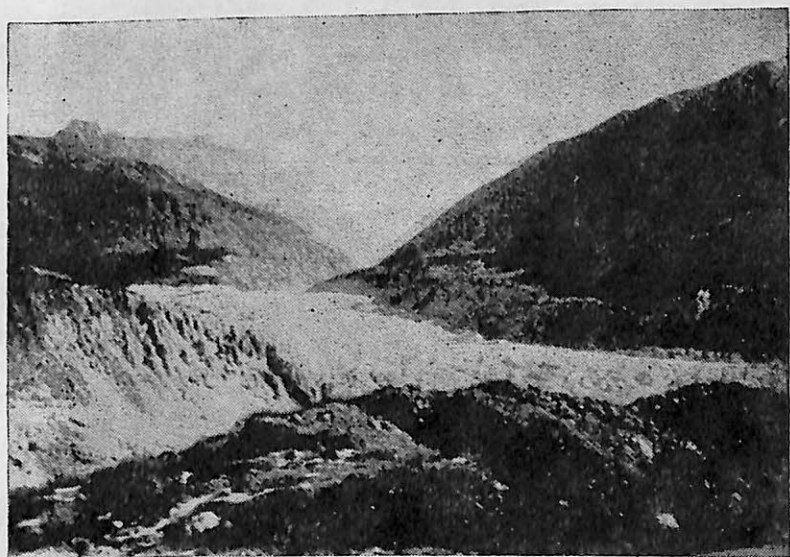
হিমালয়ের একটি হিমবাহ

বদ্রীনাথের কাছে বসুধারা এই ধরনের একটি U-আকৃতিবিশিষ্ট উপত্যকা এবং নন্দাদেবীর চারপাশে অনেকগুলি খাড়া ঢালবিশিষ্ট শৃঙ্গ দেখা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে কয়েকটি খাড়া ঢালবিশিষ্ট শৃঙ্গ পরস্পর মিলিত হয়ে অপেক্ষাকৃত নিম্নবর্তী স্থানে হ্রদের (cirque) সৃষ্টি করেছে। তাদের মধ্যে এভারেস্ট, নন্দাদেবী কাশ্মীরের ত্রিমূর্তি শৃঙ্গের পাদদেশে অবস্থিত হ্রদ উল্লেখযোগ্য। হিমবাহ গতিপথে প্রচুর শিলাখণ্ড, শিলাচূর্ণ এবং কর্দম ইত্যাদি বহন করে নিয়ে আসে; হিমবাহ গলতে

শুরু করলে ঐসব পদার্থ জমা হয়ে গ্রাবরেখার সৃষ্টি করে এবং বিভিন্নভাবে সঞ্চিত হয়ে ভূপ্রকৃতির পরিবর্তন সাধন করে। হিমালয় অঞ্চলে হিমরেখার নিচে এইরকম অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায়।

হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে বেশ কয়েকটি বিশেষ ধরনের অবতল বা উপত্যকা দেখা যায়। ভূবিজ্ঞানীদের মতে এইসব অবতল প্রথমে হ্রদ আকারে দেখা দেয়। পরবর্তী কালে বিশেষ কারণে হ্রদের জল সম্পূর্ণভাবে নিষ্কাশিত হয়ে শূন্য স্থানটি হিমবাহ এবং নদীবাহিত ক্ষয়িত পদার্থ জমা হয়ে সমতল উপত্যকা বা হ্রদীয় অবতলে রূপান্তরিত হয়েছে। সাগরাঙ্ক (sea level) থেকে ১৫৮৫ মি উর্ধ্বে অবস্থিত কাশ্মীর উপত্যকা এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এই উপত্যকাটি ১৩৫ কি দীর্ঘ এবং প্রায় ৪০ কি প্রশস্ত। এছাড়া বিপাশার উর্ধ্বগতিতে মাণ্ডি সমতল, ঘর্ঘরা নদীর উর্ধ্বগতিতে বৈজ-নাথ সমতল, নেপালের অন্তর্গত কাঠমণ্ডু ও পোখরা সমতল, ভুটানের অন্তর্গত পারো, থিম্পু ও পুনাখা সমতল এইভাবে সৃষ্টি হয়েছে।

হিমালয়ের একটি অফুরন্ত সম্পদ বনজ সম্পদ। উচ্চতা অনুসারে উদ্ভিদের প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়। যেমন, ৫০০০ মিটারের উর্ধ্বে বৃক্ষজাতীয় কোন উদ্ভিদ জন্মায় না। ৪০০০ থেকে ৫০০০ মিটার উচ্চতায় একমাত্র আল্পীয় তৃণভূমি দেখা যায়। ২৫০০ থেকে ৩৫০০ মিটারের মধ্যে সাধারণত সরলবর্গীয় চিরহরিৎ অরণ্য। আরও নিচে পর্ণমোচী বৃক্ষ এবং ১০০০ মিটারের নিচে ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় বৃক্ষের সমাবেশ দেখা যায়।

ভৌগোলিক বিভাগ

ভূপ্রাকৃতিক বিভাগের মাধ্যমে হিমালয় অঞ্চলের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে না। প্রধানত জলবায়ু ও উদ্ভিদের তারতম্য পশ্চিম থেকে পূর্বদিকেই পরিলক্ষিত হয়। ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু ইত্যাদির প্রভাবে মানুষের জীবনধারাও পরিবর্তিত হয়। এই ধরনের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে হিমালয়কে তিনটি প্রাথমিক ভৌগোলিক অঞ্চলে ভাগ করা হয়।

(১) পশ্চিম হিমালয় — (ক) কাশ্মীর হিমালয়;

(২) মধ্য হিমালয় — (খ) হিমাচল; (গ) কুমায়ুন; এবং (ঘ) নেপাল হিমালয়;

(৩) পূর্ব হিমালয় — (ঙ) দার্জিলিং-ভুটান--অরুণাচল হিমালয়।

(১) পশ্চিম হিমালয়

প্রধানত সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে পশ্চিম হিমালয়, মধ্য এবং পূর্ব হিমালয় থেকে অনেকটা পৃথক। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, প্রাচীন কাল থেকে কাশ্মীর

অঞ্চল তিনটি বিভিন্ন ধর্মীয় মানুষের মিলনস্থল হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছে। ভারতের হিন্দু, পশ্চিম এশিয়া থেকে আগত মুসলমান এবং উত্তরের তিব্বত ও মঙ্গোলশ্রেণীয় বৌদ্ধরা দীর্ঘকাল ধরে কাশ্মীরের অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, মনোরম জলবায়ু এবং কৃষিসম্ভারের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এসেছে। এইসব বিপরীত সংস্কৃতি আজও কাশ্মীর-কে তিনটি পৃথক অংশে বিভক্ত করে রেখেছে। যেমন হিন্দু-অধ্যুষিত জম্মু, বৌদ্ধ-অধ্যুষিত লাদাখ এবং মুসলমান-অধ্যুষিত গিলগিট-বালতিস্তান এবং পুঞ্চ। একমাত্র উপত্যকাংশে এই তিন ধর্ম ও সংস্কৃতি পরস্পর মিলেমিশে একটি স্বতন্ত্র রূপ নিয়েছে।

কাশ্মীর হিমালয়

অবস্থান: ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত কাশ্মীর অঞ্চল রাজনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর পূর্ব এবং উত্তর দিকে তিব্বত (চীন), উত্তরে কিছুটা অংশে আফগানিস্তান এবং পশ্চিম দিকে পাকিস্তান। কাশ্মীর অঞ্চলের প্রকৃত আয়তন ২২২,২৩৬ বর্গ কি; কিন্তু ১৯৪৯ সালে পাকিস্তান এই অঞ্চলের পশ্চিমার্ধের একটি বৃহৎ অংশ (৮৪১১২ ব কি) এবং ১৯৬২ সালে চীন পূর্বার্ধের কিছুটা অংশ (৪১১৯৬ বর্গ কি) অধিকার করে নেবার পর ভারতের হাতে প্রকৃত-পক্ষে কাশ্মীরের অর্ধেকেরও কম অংশ রয়েছে। ভারতের অন্তর্বর্তী কাশ্মীর অঞ্চল তিনটি প্রধান বিভাগ ও মোট নয়টি জেলায় বিভক্ত। যথা, (ক) কাশ্মীর: জেলা—অনন্তনাগ, শ্রীনগর এবং বরমূলা; (খ) জম্মু: জেলা—ডোডা, উধমপুর, জম্মু, কাথুয়া এবং পুঞ্চ; (গ) লাদাখ। এছাড়া ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ-বিরতি সীমারেখার পশ্চিমে অবস্থিত জেলা গিলগিট, ওয়াহারাত, ট্রাইবাল টেরিটরি, চিলাস, মুজফ্‌ফরাবাদ, মীরপুর এবং পুঞ্চ (পশ্চিম) কাশ্মীর অঞ্চলের অন্তর্গত।

ভূপ্রকৃতি ও নদনদী: কাশ্মীর অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি প্রধানত পর্বতময় বলে অত্যন্ত বন্ধুর। উত্তর থেকে দক্ষিণে এখানকার পর্বতশ্রেণীগুলির নাম যথাক্রমে (১) কুনলুন, (২) কারাকোরাম, (৩) লাদাখ, (৪) উচ্চ হিমালয় ও জাস্কার, (৫) পির পাঞ্জাল এবং (৬) শিবালিক পাহাড়। শিবালিক পাহাড় জম্মু পাহাড় নামেও পরিচিত। শিবালিক ও হিমাচলের মধ্যবর্তী অংশে উধমপুর, কোট্‌লী অবতল বা দুন উপত্যকা অবস্থিত। শিবালিকের দক্ষিণে একটি সংকীর্ণ সমভূমি আছে (মানচিত্র ৬)।

কাশ্মীর অঞ্চলের কুনলুন পর্বত অত্যন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত মালভূমির আকার ধারণ করেছে এবং সাগরাঙ্ক থেকে প্রায় ৪৫০০ মি উচ্চ হওয়া সত্ত্বেও এখানে অনেকগুলি লবণ-হ্রদ আছে। উত্তর-পূর্বাংশের এই অংশ আকশাই-চীন নামে পরিচিত। প্রায় ৪০০ কি দীর্ঘ কারাকোরাম পর্বতের শিখরদেশ চিরতুষারাবৃত। পৃথিবীর দ্বিতীয় উচ্চতম শৃঙ্গ গডউইন অস্টেন (৮৬১২ মি) এই পর্বতমালায় অবস্থিত। এছাড়া এই পর্বতে আরও ছয়টি শৃঙ্গ (৭৫০০ মিটারের উর্ধ্বে) বর্তমান। পৃথিবীর কোন পর্বতে এতগুলো

সুউচ্চ শৃঙ্গ নেই। অত্যুচ্চ শৃঙ্গদেশ থেকে কয়েকটি বিশাল হিমবাহ জন্মলাভ করেছে। কারাকোরাম পর্বতের দক্ষিণে লাদাখ পর্বত একটি ঋজু প্রাচীরের মত সরলরেখায় প্রায় ৩০৬ কি বিস্তৃত। এই পর্বতের নয়টি শৃঙ্গের উচ্চতা ৬০০০ মিটারের ঊর্ধ্বে। সিন্ধুনদীর দক্ষিণমুখী বাঁক থেকে উচ্চ হিমালয় আরম্ভ হয়েছে। পূর্ব দিকে প্রসারিত হয়ে পর্বতটি দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে উত্তর শাখা জাস্কার পর্বত ও দক্ষিণ শাখা

পশ্চিম হিমালয় এবং পূর্ব হিমালয় অন্তর্গত হিমাচল ও কুমায়ুন অঞ্চলের পর্বত শ্রেণী ও প্রধান নদী

মানচিত্র ৬

উচ্চ হিমালয় নামে পরিচিত। এই পর্বতমালা কাশ্মীরে দীর্ঘতম ও উচ্চতম। এখানকার তেরটি পর্বতশৃঙ্গ ৬০০০ মিটারের ঊর্ধ্বে। পশ্চিমদিকে নাঙ্গা পর্বতশৃঙ্গের

ঢাল থেকে কয়েকটি বিশাল হিমবাহের জন্ম হয়েছে। উচ্চ হিমালয়ের দক্ষিণে অবস্থিত পির পাঞ্জালের গড় উচ্চতা ৩৫০০ থেকে ৫০০০ মি। এই পর্বত থেকে অনেকগুলি শাখা বেরিয়ে নানা দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। দক্ষিণদিকের পর্বত ঢাল অত্যন্ত খাড়া। পির পাঞ্জাল ও উচ্চ হিমালয়ের মাঝখানে অবস্থিত কাশ্মীর উপত্যকার সমতলভূমিতে স্থানে স্থানে জলাভূমি ছাড়া অনেকগুলি ছোট বড় হ্রদ আছে। তাদের মধ্যে উলার হ্রদ বৃহত্তম। উপত্যকার প্রান্তভাগে, বিশেষভাবে দক্ষিণ দিকে, সর্বশেষ হিমবাহযুগের (Pleistocene Glaciation) গ্রাবরেখা সঞ্চিত হয়ে সমতলশীর্ষবিশিষ্ট ধাপের সৃষ্টি করেছে। স্থানীয় ভাষায় এদের কারোয়া (সর্বোচ্চ ১৪০ মি) বলা হয়। বিতস্তা কাশ্মীর উপত্যকার উত্তর প্রান্ত দিয়ে বয়ে চলেছে। পির পাঞ্জালের দক্ষিণে শিবালিক পর্বত বা জম্মু পাহাড় ৬১০ থেকে ১২২০ মি উঁচু। এই পর্বত খুবই ক্ষয়প্রাপ্ত এবং দক্ষিণ দিকে ধীরে ধীরে একটি নাতিপ্রস্থ সমভূমির সঙ্গে মিশে গেছে।
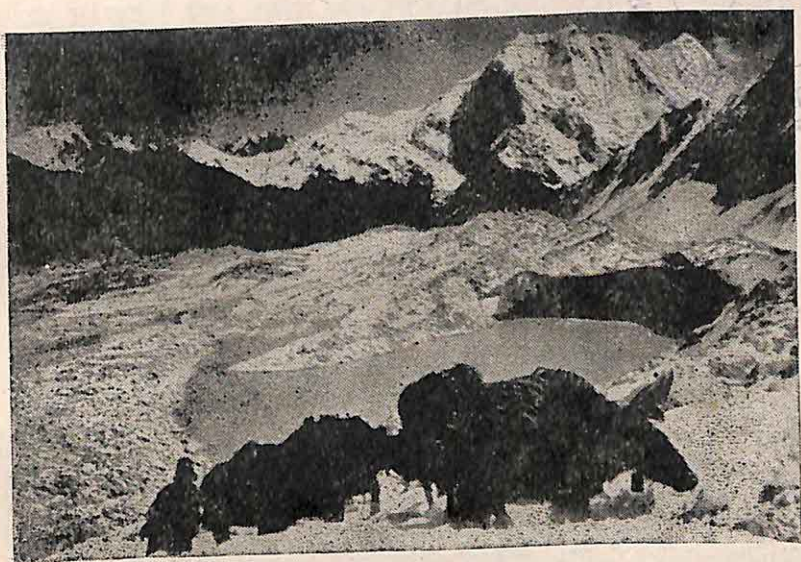
হিমালয়ের একটি গিরিপথ

উল্লিখিত দুরারোহ পর্বতমালার অনেক স্থানে গিরিসঙ্কট বা গিরিপথের মধ্য দিয়ে মানুষের আসা-যাওয়া প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে। এই অঞ্চলে মোট গিরিপথের সংখ্যা প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি। তার মধ্যে কারাকোরাম পর্বতের হিস্পার গিরিপথ (৫৩৫২ মি), মুঝতাঘ গিরিপথ (৫৭০০ মি); লাদাখ পর্বতের দিগার লা (৫৪০০ মি), চাঙ্গলা (৫৫৯৯ মি), উচ্চ হিমালয়ের জজি লা (৩৫২৯ মি), পোটলা

(৫৭১৬ মি), পির পাঞ্জাল পর্বতের পির পাঞ্জাল (৩৪৯৪ মি), বানিহাল (২৮৩২ মি) ইত্যাদি গিরিপথের নাম করা যেতে পারে।

সিন্ধু এই অঞ্চলের প্রধান নদী। পূর্বে তিব্বতের মালভূমি থেকে জন্ম লাভ করে পশ্চিমবাহিনী হয়ে সিন্ধু কাশ্মীর অঞ্চলে প্রবেশ করেছে এবং দীর্ঘ পথ প্রবাহিত হবার পর প্রধান হিমালয়কে ভেদ করে হঠাৎ দক্ষিণমুখী বাঁক নিয়েছে (মানচিত্র ৬)। ভূবিজ্ঞানীদের মতে হিমালয়ের প্রধান শাখা পর্বতাকারে আত্মপ্রকাশের পূর্বেই সিন্ধুর জন্ম হয়েছে এবং পরবর্তী কালে হিমালয়ের ধীর উত্থানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে খাত কেটে চলেছে। পর্বতের উত্থান নদীর গতি পরিবর্তন করতে পারেনি। এই ধরনের নদীকে পূর্ববর্তী (antecedent) নদী বলা হয়। সিন্ধুর উত্তরদিকস্থ উপনদী সায়ক, সিগার, গিলগিট ও দক্ষিণদিকস্থ উপনদী এ্যাস্টর, দক্ষিণ সিগার, জাস্কার এবং হানলে। বিতস্তা নদী কাশ্মীর উপত্যকার পূর্ব দিকের পর্বত থেকে জন্মলাভ করে উলার হ্রদে প্রবেশ করেছে এবং সেখান থেকে বেরিয়ে একটি গিরিখাতের মধ্য দিয়ে পির পাঞ্জাল অতিক্রম করে চুলের কাঁটা-সদৃশ দক্ষিণমুখী বাঁক নিয়েছে। এর প্রধান উপনদী লিড্ডার, সিন্ধু, কিসেনগঙ্গা ও পুঞ্চ। পির পাঞ্জালের পূর্বার্ধে দক্ষিণ ঢালকে অনুসরণ করে চন্দ্রভাগা প্রবাহিত।

জলবায়ু: কাশ্মীর হিমালয়ের জলবায়ু প্রধানত নাতিশীতোষ্ণ মহাদেশীয় ও শীতল মহাদেশীয় শ্রেণীর। কোথাও তা আবার উপক্রান্তীয় পর্যায়ের। শীতল মহাদেশীয় বা আল্পীয় লাদাখ অঞ্চলের গড় মাসিক উত্তাপ -৭·৯° থেকে ১৭·৮° সে পর্যন্ত থাকে। জানুয়ারি মাসে সর্বনিম্ন তাপাঙ্ক -২৮·৩° সে। তুষারপাতের মাধ্যমে মোট বর্ষণের পরিমাণ ১১·৫ সেন্টিমিটার। ডিসেম্বর থেকে মার্চের মধ্যে এই তুষারপাত ঘটে।

গিলগিট ও কাশ্মীর উপত্যকার জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ মহাদেশীয় এবং জম্মুতে উপক্রান্তীয় মহাদেশীয় পর্যায়ের। কাশ্মীর উপত্যকা ও জম্মু অঞ্চল মৌসুমী জলবায়ু প্রভাবিত। শীতকালে উভয়াঞ্চলে পশ্চিম বায়ুপ্রবাহ থেকে বৃষ্টিপাত ঘটে থাকে। উপত্যকা অঞ্চলে শ্রীনগরে গ্রীষ্মকালীন সর্বোচ্চ উত্তাপ ৩৮·৩° সে ও শীতকালীন সর্বনিম্ন উত্তাপ-২০° সে। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৬৭·৫° সেন্টিমিটার। জম্মুর গ্রীষ্মকালীন ও শীতকালীন গড় উত্তাপ যথাক্রমে ৩৩° এবং ১৩° সে। এখানে গড় বৃষ্টির পরিমাণ ১১৫ সেন্টিমিটার।

স্বাভাবিক উদ্ভিদ: শিলারাশির প্রকারভেদ, পর্বতের উচ্চতা, ঢাল এবং জলবায়ুর বৈচিত্র্য এই অঞ্চলের স্বাভাবিক উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও বিশেষভাবে প্রতিফলিত। কাশ্মীর উপত্যকা এবং জম্মুপ্রদেশ ব্যতীত আর কোথাও অরণ্য প্রায় দেখা যায় না। কাশ্মীর উপত্যকার প্রায় ৫৮ শতাংশ ভূমি অরণ্যাচ্ছাদিত। এই অরণ্য প্রধানত সরলবর্গীয়। বৃক্ষের মধ্যে উইলো, ফার এবং দেবদারু অর্থনৈতিক বিচারে বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

পির পাঞ্জালের বৃষ্টিবহুল দক্ষিণ ঢালে অরণ্য পাতলা এবং তা পর্ণমোচী শ্রেণীর। কিন্তু উত্তর ঢাল ঘন সরলবর্গীয় অরণ্যে আচ্ছাদিত। শিবালিক পর্বতাঞ্চলে সাধারণত শুষ্ক গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ জন্মায়। অন্যান্য স্থানে পর্বতের অত্যধিক উচ্চতা হেতু উদ্ভিদ ক্রমে বিরল হয়ে এসেছে। হিমরেখার কাছাকাছি পর্বতঢালে ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ ছাড়া অন্য কিছু জন্মায় না। একে আল্পীয় তৃণভূমি বলা হয়। লাদাখ অঞ্চলটি প্রায় উদ্ভিদশূন্য; কেবল অপেক্ষাকৃত নিচু, ছায়াবৃত স্থানে কিছু সিডার ও উইলো জাতীয় বৃক্ষ দেখা যায়।

কৃষিকার্য: পর্বতের উচ্চাংশে মাটির আস্তরণ খুব পাতলা। একমাত্র আল্পীয় তৃণভূমিতে মাটি কিছুটা গভীর। পর্বতাঞ্চলে মৃত্তিকা অনেক স্থানে পডজল জাতীয়; এতে অম্লের আধিক্য চাষের পক্ষে ক্ষতিকর। কাশ্মীর উপত্যকা এবং জম্মু পাহাড়ের পাদদেশবর্তী স্থানে মৃত্তিকা পলল শ্রেণীর।

অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা কৃষিকার্য। মোট কর্মরত মানুষের ৪৩ শতাংশ কৃষিকার্যের ওপর সরাসরি নির্ভরশীল। কৃষিকার্যের পরেই অরণ্যবৃত্তি (১৭ শতাংশ) ও পশুপালনের (৯ শতাংশ) স্থান।

বন্ধুর প্রকৃতির জন্য সমগ্র অঞ্চলের মাত্র ৫ শতাংশ ভূমি প্রকৃত অর্থে কর্ষণযোগ্য। একমাত্র কাশ্মীর উপত্যকাতে ২০ শতাংশ ভূমি কৃষিকার্যে নিয়োজিত। এখানকার কৃষির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল নিবিড় চাষ (intensive cultivation) এবং সোপান চাষ (terrace cultivation)। প্রায় ২১ শতাংশ জমি দো-ফসলা। মোট জমির ৪০ শতাংশকে জলসেচের আওতায় আনা হয়েছে। পাহাড়ের ধাপে নালা ও উপত্যকায় নদীর সাহায্যে জলসেচ করা হয়। জলসেচের অভাব এবং তুষারপাতের জন্য বছরে আট মাসের বেশি চাষ করা সম্ভব হয় না।

উত্তরাংশে বছরে মাত্র একটি ফসল হয়; জম্মু ও কাশ্মীর উপত্যকায় প্রধানত দুটি ফসল উৎপাদিত হয়ে থাকে। লাদাখ অঞ্চলে কেবলমাত্র জলসেচের সাহায্যে চাষ সম্ভব।

কর্ষিত ভূমির ৯০ শতাংশ খাদ্যফসল উৎপাদনে নিয়োজিত। খাদ্যফসলের মধ্যে ধান প্রধান। ধানের পরই অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমিতে ভুট্টার স্থান। গম তৃতীয় প্রধান ফসল। এছাড়া জোয়ার, বাজরা ও লাদাখের রাগি উল্লেখযোগ্য। বাণিজ্যিক ফসলের মধ্যে আপেল, খুবানি, আখরোট, জাফরান ও তৈলবীজ প্রধান।

রেশমচাষ ও পশুপালন সাময়িক বৃত্তি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়েছে। রেশম-গুটি উৎপাদনের জন্য উপত্যকা অঞ্চলে তুঁতগাছের ব্যাপক চাষ হয়ে থাকে। কাঁচা রেশম কাশ্মীর অঞ্চলের একটি প্রধান রপ্তানীবস্তু। পশুপালনের ক্ষেত্রে মেষচারণ সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এবং তা মূলত ঋতুগত পরিব্রাজনের (transhumance) ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে। প্রতি গ্রীষ্মে পশুগুলোকে পর্বতের উচ্চভাগের

তৃণভূমিতে নিয়ে যাওয়া হয়; শীতকালে আবার তাদের নিচে নামিয়ে আনা হয়। এইসব তৃণভূমিকে স্থানীয় ভাষায় 'মার্গ' বলা হয়; যেমন গুলমার্গ, সোজমার্গ, খিলান-মার্গ ইত্যাদি। মেষ থেকে প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য পশম, মাংস ইত্যাদি।

খনিজ সম্পদ ও শিল্প: কাশ্মীর অঞ্চল খনিজ সম্ভারে সমৃদ্ধ নয়। প্রধান খনিজ সম্পদ হিসেবে কয়লা, লিগনাইট (নিম্ন শ্রেণীর কয়লা) ও চুনাপাথরের নাম করা যেতে পারে। জম্মুপ্রদেশের কয়লা অর্থনৈতিক বিচারে মূল্যবান। চুনাপাথর নানা রকম নির্মাণকার্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এছাড়া অনন্তনাগ, সদরকোট ও লাদাখের উষ্ণ প্রস্রবণ থেকে গন্ধক, লাদাখের উষ্ণ প্রস্রবণ থেকে সোহাগা, রিয়াসি ও পুঞ্চের চকসাইট এবং অধুনা আবিষ্কৃত তাম্র, দস্তা ও নিম্নশ্রেণীর লৌহ ইত্যাদি উল্লেখ-যোগ্য।

শিল্পগঠনে এই অঞ্চলের অনগ্রসরতা লক্ষণীয়। অধিকাংশ শিল্প কুটিরশিল্পের আকারে গড়ে উঠেছে। এদের মধ্যে বয়নশিল্পের স্থান প্রথম। প্রাচীন কাল থেকে পশম ও রেশম তৈরি এবং বস্ত্রবয়নের কাজ ঘরে ঘরে চলে আসছে। কাশ্মীরের পশমী শাল ও কার্পেটের পৃথিবীজোড়া খ্যাতি আজও ম্লান হয়নি। রেশম ও পশমে অপূর্ব সূচীশিল্প কাশ্মীর উপত্যকায় সীমাবদ্ধ। অন্যান্য কুটির শিল্পের মধ্যে তুষের চাদর, কাঠখোদাই, উইলো কাঠের ক্রিকেট ব্যাট ইত্যাদি প্রধান।

কারখানা শিল্পের মধ্যে অস্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড ও ব্রিটেন থেকে আমদানিকৃত উৎকৃষ্ট পশমকে অবলম্বন করে পশম শিল্প, রেশম শিল্প, দিয়াশলাই শিল্প, চালকল, ময়দাকল ইত্যাদি শিল্প উল্লেখ্য।

কাশ্মীরের নৈসর্গিক সৌন্দর্যের জন্য পর্যটন শিল্পের গুরুত্ব যথেষ্ট। ভূস্বর্গ কাশ্মীরে প্রতি বছর কয়েক লক্ষ দেশী ও বিদেশী পর্যটক মার্চ থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত প্রমোদ ভ্রমণে গিয়ে থাকে।

যোগাযোগ ব্যবস্থা: পার্বত্য ভূপ্রকৃতি যোগাযোগ ব্যবস্থার পথে প্রধান অন্তরায়। সমগ্র অঞ্চলের একমাত্র কাথুয়া থেকে জম্মু ভিন্ন অন্য কোথাও রেলপথ নির্মিত হতে পারেনি। একই কারণে নদীপথ ও বিমানপথ বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেনি। অতএব যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রধান অবলম্বন স্থলপথ এবং তাও সর্বত্র সমভাবে উন্নত নয়। অধিকাংশ পাকা সড়ক উপত্যকা ও সমভূমি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। দক্ষিণে পাঞ্জাব সমভূমিতে অবস্থিত পাঠানকোটকে কাথুয়া, জম্মু, বানিহাল, অনন্তনাগ, শ্রীনগর, বরমূলা ও উরি শহরের সঙ্গে যুক্ত করে এই অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সড়কটি নির্মিত হয়েছে। জম্মু ও শ্রীনগরে বিমানবন্দর আছে। কাশ্মীর অঞ্চলের অন্যান্য অংশে পায়ে চলা পথ যোগাযোগ রক্ষার একমাত্র উপায় (মানচিত্র ৭)।

বসতি, শহর ও নগর: এই অঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসী গ্রামে বাস করে। উপত্যকা অঞ্চলে গ্রামগুলি সাধারণত আকারে ছোট ও সন্নিবিষ্ট (compact)
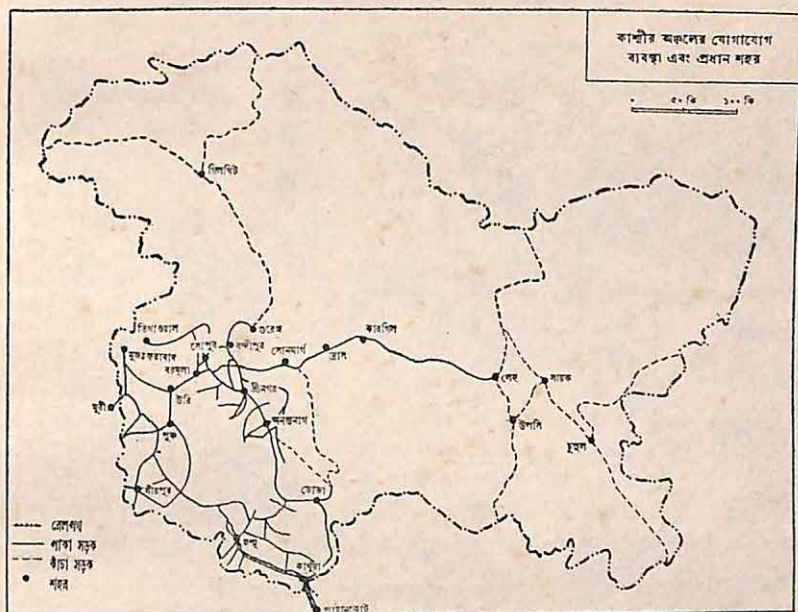
মানচিত্র ৭

প্রকৃতির। ভূমির বন্ধুরতার জন্য পার্বত্য অঞ্চলে গ্রামগুলি ছড়ানো ভাবে অনেকটা জায়গা জুড়ে থাকলেও তার লোকসংখ্যা বেশি নয়। ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের গৃহ-বংশানুক্রমিকভাবে একটি যৌথ আঙিনাকে ঘিরে ঘন সন্নিবদ্ধভাবে তৈরি হয়। গৃহ নির্মাণে কাঠ, শিলা, মাটি, ঘাস ইত্যাদির ব্যবহার প্রচলিত। অনেক স্থানে গৃহ দুইতল বিশিষ্ট; নিচের তলায় পশুদের রাখা হয় এবং ওপরের তলায় মানুষ বাস করে। পশুদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে ওপরতলা উত্তপ্ত থাকে। লাদাখ অঞ্চলে শুষ্ক আবহাওয়ার জন্য সমতল ছাদবিশিষ্ট গৃহ নির্মিত হয়।

কাশ্মীর অঞ্চলের মোট অধিবাসীর ১৮ শতাংশ মাত্র শহরে বাস করে। এখানে সর্ব-সমেত ৪৫টি শহর আছে। এদের মধ্যে একমাত্র শ্রীনগর ও জম্মুকে নগর বলা যায়।

শ্রীনগর (জনসংখ্যা: ৪১৫,২৭১): সমুদ্রাঙ্ক থেকে প্রায় ১৫৮৫ মি উর্ধ্বে বিতস্তার দুই তীরে ও ডাল হ্রদের ধারে অবস্থিত শ্রীনগর কাশ্মীর উপত্যকা তথা সমগ্র কাশ্মীর অঞ্চলের প্রাণকেন্দ্র। এই সৌন্দর্য-নগরীর খ্যাতি সর্বজনবিদিত। বাদশাহ জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের আমলের শালিমার বাগ, নিশাদ বাগ পর্যটকদের নিকট অতি আকর্ষণীয়। ডাল হ্রদ ও বিতস্তার জলে বজরাবাস (houseboat) অন্যতম আকর্ষণ। শ্রীনগর একটি প্রধান সড়ককেন্দ্র। এখানকার রেশম, পশম, কার্পেট, কম্বল, কাঠখোদাই, সূচীশিল্প ও চর্মশিল্প বিখ্যাত।
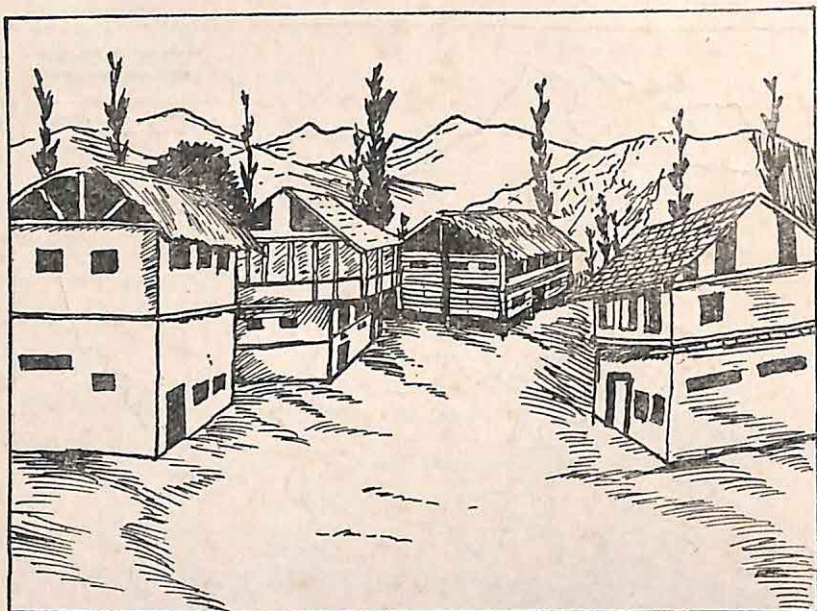
কাশ্মীরের দোতলা বাড়ি
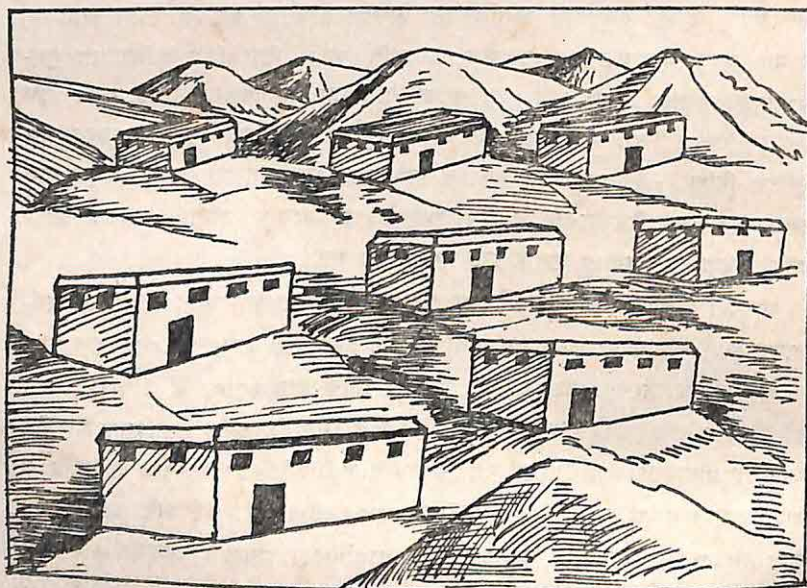
লাদাখ অঞ্চলের সমতল ছাদের বাড়ি
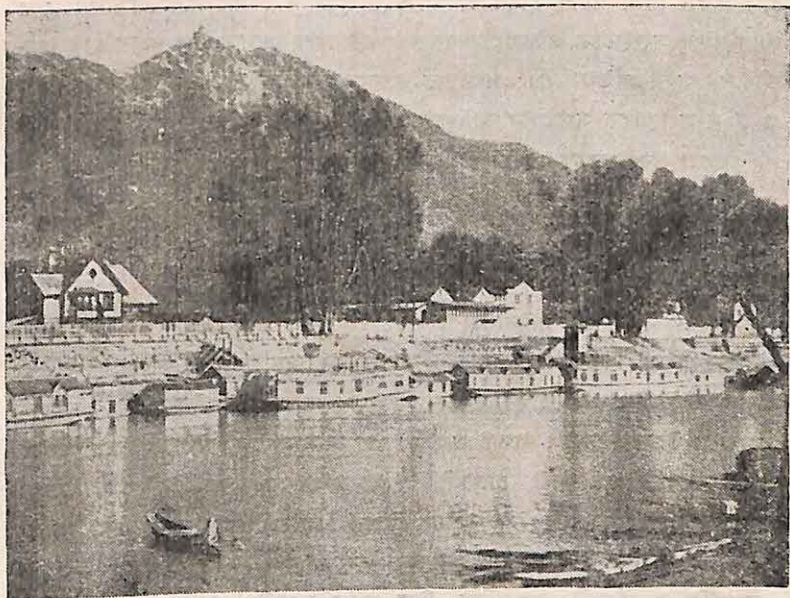
শ্রীনগরে বিতস্তার ওপরে বজরাবাস

জম্মু (জনসংখ্যা: ১৫৭,৯০৮): সাগরাঙ্ক থেকে প্রায় ৪০০ মি উর্ধ্বে শিবালিক পর্বতের দক্ষিণ ঢালে অবস্থিত কাশ্মীরের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। এখানকার নানাবিধ কলকারখানা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য।

লেহ্ (জনসংখ্যা: ৫৫১৯): চীন, তিব্বত ও ভারতের মধ্যে গিরিপথের সংযোগ-স্থলে ক্যারাভান সরাই বা বাণিজ্যিক ভ্রমণের বিশ্রামস্থান হিসেবে লেহ্ জনপদ গড়ে উঠেছে। তিব্বত ও পশ্চিম হিমালয়ের কিছু অংশ চীন কর্তৃক অধিকৃত হওয়ায় লেহ্‌র বাণিজ্যিক গুরুত্ব অনেকখানি লোপ পেয়েছে। এখানকার প্রাচীন লাদাখী রাজার প্রাসাদটি লাসার পোটালা প্রাসাদের অনুকরণে তৈরি।

(২) মধ্য হিমালয়

হিমাচল অঞ্চলের সংস্কৃতি, পশ্চিম হিমালয়ের সংস্কৃতির মত মিশ্র নয়। তা প্রাচীনকাল থেকেই হিন্দু সংস্কৃতির অঙ্গীভূত। আর্যরা হিমাচলকে 'দেবভূমি' আখ্যা দিয়েছিল। আর্য সভ্যতার সাক্ষ্যস্বরূপ অসংখ্য দেবস্থান এই অঞ্চল জুড়ে আজও বর্তমান। সেদিক থেকে কুমায়ুন অঞ্চলও একই বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। কুমায়ুন অঞ্চলে কিছু মঙ্গোলীয় অনুপ্রবেশ সত্ত্বেও এই অঞ্চলে গঙ্গার জন্মস্থান (গঙ্গোত্রী) হিন্দু

দের নিকট পরম পবিত্র তীর্থ। হিমাচল ও কুমায়ুন মিলিতভাবে আর্যদের সময় থেকে হিন্দু সংস্কৃতির একক প্রাধান্যকে বজায় রেখে এসেছে এবং তার ছাপ জন-জীবনের সর্বত্র প্রতিফলিত। পক্ষান্তরে নেপালে বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রভাব এবং হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির সহাবস্থান অধিবাসীদের জীবনযাত্রাকে ভিন্ন রূপ দিয়েছে।

(নেপাল একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র বলে তার ভৌগোলিক আলোচনা এখানে করা হল না।)

হিমাচল এবং কুমায়ুন অঞ্চল

অবস্থান: কাশ্মীরের দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত হিমাচল অঞ্চল মোট দশটি জেলা নিয়ে গঠিত---মাহাসু, কিন্নর, মাণ্ডি, চম্বা, সিরমুর, বিলাসপুর, সিমলা, কাংড়া, কুলু এবং লাহুল ও স্পিটি। হিমাচলের দক্ষিণে যথাক্রমে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা, পূর্বে কুমায়ুন অঞ্চল ও উত্তরে তিব্বত। মোট সাতটি জেলা নিয়ে কুমায়ুন অঞ্চল গঠিত। জেলা-গুলির নাম---উত্তর কাশী, চামোলী, পিথোরাগড়, আলমোড়া, নৈনিতাল, তেহরী গাড়োয়াল, এবং দেরাদুন। কুমায়ুনের উত্তরে তিব্বত, পূর্বে নেপাল এবং দক্ষিণে উত্তরপ্রদেশ। দুটি অঞ্চলের মোট আয়তন ১০২৫০৪ বর্গ কি মি।

ভূপ্রকৃতি ও নদনদী: ভূপ্রকৃতির দিক থেকে কাশ্মীর অঞ্চলের সঙ্গে হিমাচল অঞ্চলের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। হিমালয়ের মূল শাখাগুলো এখানে পরস্পর সমান্তরাল ভাবে উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রসারিত। উত্তর থেকে দক্ষিণে যথাক্রমে জাস্কার, উচ্চ হিমালয় ও পির পাঞ্জাল, ধওলাধর, সর্বশেষে শিবালিক পর্বত এবং তাদের মধ্যবর্তী আরও কয়েকটি পর্বত-শাখা বর্তমান। জাস্কার ও উচ্চ হিমালয়ের গড় উচ্চতা ৫০০০ মিটারের ওপর এবং এখানে কয়েকটি বিশাল হিমবাহের জন্ম হয়েছে। পির পাঞ্জাল উচ্চ হিমালয় থেকে বেরিয়ে পশ্চিমে প্রসারিত। এই পর্বতে কয়েকটি গিরিপথ আছে। পির পাঞ্জালের দক্ষিণে ধওলাধর পর্বতের গড় উচ্চতা প্রায় ৩৬৬০-৪৫৭০ মি এবং এই পর্বতের অনেক শাখা-প্রশাখা চারদিকে ছড়িয়ে গেছে। উত্তর দিকে বিপাশার ঊর্ধ্বগতিতে কুলু উপত্যকা এবং ধওলাধরের দক্ষিণে কাংড়া উপত্যকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হিমাচলের দক্ষিণাংশে শিবালিক পর্বতের উচ্চতা অপেক্ষাকৃত কম (৬১০-৯১৫ মি)। এই পর্বতটি অত্যন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত (মানচিত্র ৬)।

কুমায়ুন অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি প্রায় একই ধরনের। মূল পর্বতশ্রেণী উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্বে প্রসারিত এবং এখানে পর্বতের ঢাল দক্ষিণ দিকে বেশি খাড়া। উচ্চ হিমালয়ের উচ্চতা এখানে ৪৮০০ মি থেকে ৬০০০ মি। এখানে অনেকগুলি পর্বতশৃঙ্গ বর্তমান। প্রধান হিমালয়ের দক্ষিণে অবস্থিত হিমাচল পর্বত-শ্রেণী খুবই প্রশস্ত এবং তার অসংখ্য শাখা-প্রশাখা নানাদিকে ছড়িয়ে পড়ে একটি ঘন জটের সৃষ্টি করেছে (মানচিত্র ৬)। হিমবাহের ক্রিয়া এখানে খুবই সুস্পষ্ট।

দের নিকট পরম পবিত্র তীর্থ। হিমাচল ও কুমায়ুন মিলিতভাবে আর্যদের সময় থেকে হিন্দু সংস্কৃতির একক প্রাধান্যকে বজায় রেখে এসেছে এবং তার ছাপ জন-জীবনের সর্বত্র প্রতিফলিত। পক্ষান্তরে নেপালে বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রভাব এবং হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির সহাবস্থান অধিবাসীদের জীবনযাত্রাকে ভিন্ন রূপ দিয়েছে।

(নেপাল একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র বলে তার ভৌগোলিক আলোচনা এখানে করা হল না।)

হিমাচল এবং কুমায়ুন অঞ্চল

অবস্থান: কাশ্মীরের দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত হিমাচল অঞ্চল মোট দশটি জেলা নিয়ে গঠিত––মাহাসু, কিন্নর, মাণ্ডি, চম্বা, সিরসুর, বিলাসপুর, সিমলা, কাংড়া, কুলু এবং লাহুল ও স্পিটি। হিমাচলের দক্ষিণে যথাক্রমে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা, পূর্বে কুমায়ুন অঞ্চল ও উত্তরে তিব্বত। মোট সাতটি জেলা নিয়ে কুমায়ুন অঞ্চল গঠিত। জেলা-গুলির নাম––উত্তর কাশী, চামোলী, পিথোরাগড়, আলমোড়া, নৈনিতাল, তেহরী গাড়োয়াল, এবং দেরাদুন। কুমায়ুনের উত্তরে তিব্বত, পূর্বে নেপাল এবং দক্ষিণে উত্তরপ্রদেশ। দুটি অঞ্চলের মোট আয়তন ১০২৫০৪ বর্গ কি মি।

ভূপ্রকৃতি ও নদনদী: ভূপ্রকৃতির দিক থেকে কাশ্মীর অঞ্চলের সঙ্গে হিমাচল অঞ্চলের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। হিমালয়ের মূল শাখাগুলো এখানে পরস্পর সমান্তরাল ভাবে উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রসারিত। উত্তর থেকে দক্ষিণে যথাক্রমে জাস্কার, উচ্চ হিমালয় ও পির পাঞ্জাল, ধওলাধর, সর্বশেষে শিবালিক পর্বত এবং তাদের মধ্যবর্তী আরও কয়েকটি পর্বত-শাখা বর্তমান। জাস্কার ও উচ্চ হিমালয়ের গড় উচ্চতা ৫০০০ মিটারের ওপর এবং এখানে কয়েকটি বিশাল হিমবাহের জন্ম হয়েছে। পির পাঞ্জাল উচ্চ হিমালয় থেকে বেরিয়ে পশ্চিমে প্রসারিত। এই পর্বতে কয়েকটি গিরিপথ আছে। পির পাঞ্জালের দক্ষিণে ধওলাধর পর্বতের গড় উচ্চতা প্রায় ৩৬৬০-৪৫৭০ মি এবং এই পর্বতের অনেক শাখা-প্রশাখা চারদিকে ছড়িয়ে গেছে। উত্তর দিকে বিপাশার ঊর্ধ্বগতিতে কুলু উপত্যকা এবং ধওলাধরের দক্ষিণে কাংড়া উপত্যকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হিমাচলের দক্ষিণাংশে শিবালিক পর্বতের উচ্চতা অপেক্ষাকৃত কম (৬১০-৯১৫ মি)। এই পর্বতটি অত্যন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত (মানচিত্র ৬)।

কুমায়ুন অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি প্রায় একই ধরনের। মূল পর্বতশ্রেণী উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্বে প্রসারিত এবং এখানে পর্বতের ঢাল দক্ষিণ দিকে বেশি খাড়া। উচ্চ হিমালয়ের উচ্চতা এখানে ৪৮০০ মি থেকে ৬০০০ মি। এখানে অনেকগুলি পর্বতশৃঙ্গ বর্তমান। প্রধান হিমালয়ের দক্ষিণে অবস্থিত হিমাচল পর্বত-শ্রেণী খুবই প্রশস্ত এবং তার অসংখ্য শাখা-প্রশাখা নানাদিকে ছড়িয়ে পড়ে একটি ঘন জটের সৃষ্টি করেছে (মানচিত্র ৬)। হিমবাহের ক্রিয়া এখানে খুবই সুস্পষ্ট।

হিমাচলের দক্ষিণে দুন এবং হ্রদ অঞ্চল। দেরা, কোহত্রি, চৌখাম্বা, পাত্তি এবং কোটা দুনকে নিয়ে দুন অঞ্চল গঠিত। এদের মধ্যে দেরাদুন সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। দেরাদুন ৩৫ কি দীর্ঘ এবং ২৫ কি প্রশস্ত। পূর্বদিকে হিমাচলের দক্ষিণে কয়েকটি হ্রদ আছে। যেমন নৈনিতাল, ভীমতাল, নকুচিয়াতাল, সাততাল এবং পুনাতাল। এসব হ্রদের মধ্যে নৈনিতাল বৃহত্তম।
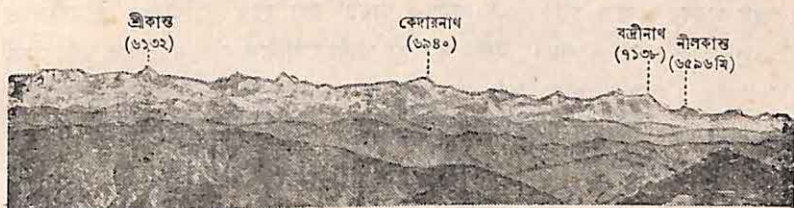
কুমায়ুন হিমালয়

হিমাচল অঞ্চলের প্রধান নদীপ্রবাহের মধ্যে চন্দ্রভাগা, ইরাবতী, বিপাশা প্রধান হিমালয় থেকে জন্মলাভ করেছে। শতদ্রু তিব্বতের মালভূমি থেকে উদ্ভূত হয়ে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হবার পথে প্রত্যেকটি পর্বতশ্রেণীকে ভেদ করেছে। শতদ্রু একটি পূর্ববর্তী নদী (antecedent river)। এছাড়া প্রধান নদীর মধ্যে যমুনা উল্লেখযোগ্য। উত্তর কাশীর নিকটবর্তী যমুনোত্রী থেকে নির্গত হয়ে হিমাচল অঞ্চলের পূর্ব সীমানা বরাবর প্রবাহিত। তুলনামূলকভাবে কুমায়ুন অঞ্চলের নদীপ্রবাহকে মোট তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়: যমুনাপ্রবাহ, গঙ্গাপ্রবাহ এবং কাশীপ্রবাহ। এর মধ্যে গঙ্গাপ্রবাহ অধিকাংশ স্থান জুড়ে আছে।

জলবায়ু: পশ্চিম হিমালয় অপেক্ষা মধ্য-হিমালয়ের জলবায়ু উষ্ণতর। পর্বত-শ্রেণীর পূর্ব-পশ্চিম বিন্যাস অনুযায়ী দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে জলবায়ুর বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। দক্ষিণের সমভূমি অঞ্চলে গ্রীষ্মকাল অত্যন্ত উষ্ণ। কিন্তু উত্তর-ভাগের পার্বত্য অঞ্চলে নাতিশীতোষ্ণ থেকে শীতল আল্পীয় জলবায়ু দেখা যায়। জুন মাসের শেষ দিক থেকে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বর্ষাকাল সূচিত হয়। এছাড়া শীত কালে পশ্চিমাবায়ুর প্রভাবে যথেষ্ট পরিমাণ তুষারপাত হয়ে থাকে। পর্বতের বাধার জন্য উত্তর দিকে বর্ষণের মাত্রা ক্রমশ কম। আবার পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত বেশি। হিমাচলে সমভূমি অঞ্চলে এবং লাহুল এবং স্পিটিতে বৃষ্টির পরিমাণ ৫০ সেন্টিমিটারের মত। সে তুলনায় কুমায়ুনের সর্বত্র বর্ষণের পরিমাণ ১০০ সেন্টিমিটারের উর্ধ্বে।

স্বাভাবিক উদ্ভিদ: মধ্য হিমালয়ের উদ্ভিদের প্রকৃতি পশ্চিম হিমালয়ের অনুরূপ।

কৃষিকার্য: সমতল ভূমি এবং উর্বর মৃত্তিকার অভাব কৃষিকার্যের পক্ষে প্রধান

অন্তরায়। অধিকাংশ স্থানে মৃত্তিকার আস্তরণ খুব পাতলা এবং শিলাখণ্ডে পূর্ণ। একমাত্র উপত্যকা অঞ্চলের মৃত্তিকা অপেক্ষাকৃত উর্বর ও দো-আঁশ শ্রেণীর।

মাত্র ১০ শতাংশ ভূমি কৃষিকার্যে নিয়োজিত হলেও হিমাচল অঞ্চলের ৯৩ শতাংশ অধিবাসীর জীবন কৃষিকার্যের ওপর নির্ভরশীল। দুন উপত্যকা ভিন্ন সর্বত্র সোপান চাষ প্রচলিত। পর্বতের ঢাল অনুযায়ী এই সব সোপান বা ধাপে সংকীর্ণ নালা কেটে জল সরবরাহ করা হয়। এই নালাকে 'নহর' বলা হয়। অধিকাংশ স্থানে বছরে একটি মাত্র ফসল জন্মায়। প্রধান ফসলের মধ্যে যথাক্রমে ভুট্টা, গম, ধান, যব, ডাল, জোয়ার ও বাজরা, ছোলা, আলু, ফল এবং আদা উল্লেখযোগ্য। নদী উপত্যকাগুলিতে গম, ভুট্টা, ধান জন্মে থাকে। পাহাড়াঞ্চলে ভুট্টা কিছুটা হয়, কিন্তু উচ্চ পার্বত্যাঞ্চলে জোয়ার ও বাজরা ভিন্ন অন্য ফসল জন্মায় না। কুলু উপত্যকা আপেল উৎপাদনের জন্য বিশেষ খ্যাত। এছাড়া অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে আঙুর, পীচ, ডালিম, লেবু, লিচু ইত্যাদি জন্মে থাকে।

হিমাচল অঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফসল হল চা। কাংড়া উপত্যকা চা চাষের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত।

কুমায়ুন অঞ্চলেও কৃষিকার্য অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা। কৃষিযোগ্য ভূমির অভাব হেতু এখানে সোপান-চাষ প্রচলিত। গম সর্বাপেক্ষা বিস্তীর্ণভাবে উৎপাদিত ফসল; পক্ষান্তরে ধানচাষ উপত্যকা ও নিম্নাঞ্চলে সীমাবদ্ধ। উচ্চভূমিতে বাজরা ও জোয়ার একমাত্র ফসল। পর্বতাঞ্চলে যবও উৎপাদিত হয়। ইক্ষু দুন অঞ্চল ভিন্ন আর কোথাও জন্মায় না। ফলচাষের মধ্যে আলমোড়া, নৈনিতাল, চামোলি এবং মুসৌরীতে আপেল, নাসপাতি, চেরী, আখরোট ও খুবানি প্রচুর পরিমাণে হয়ে থাকে।

উভয় অঞ্চলে পশুপালন জীবিকার একটি প্রধান অঙ্গ। গৃহপালিত পশু-পাখীর মধ্যে গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাঁস ও মুরগী চাষী পরিবারের সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়। সাধারণত পশম, দুধ, সার ও মাংসের জন্য পশুপালন করা হয়। পশুপালকদের ঋতুগত পরিব্রাজন এখানে লক্ষণীয়। কুমায়ুন অঞ্চলের উত্তর-পূর্বাংশে ধউলিগঙ্গা থেকে কালী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে এই ধরনের পশুচারণকে কেন্দ্র করে ভোটীয়া জীবন গড়ে উঠেছে। অধিবাসীদের নাম অনুযায়ী অঞ্চলটিকে ভোটীয়া উপত্যকা বলা হয়।

খনিজ সম্পদ ও শিল্প: খনিজ সম্পদের সম্ভাবনা উজ্জ্বল থাকা সত্ত্বেও এ পর্যন্ত উভয় অঞ্চল খনিজ সম্পদের উৎপাদনে অনগ্রসর। হিমাচল অঞ্চলের মাণ্ডিতে পাথুরে লবণ এবং মাণ্ডি, চম্বা ও কাংড়াতে স্লেট পাথর উত্তোলিত হয়। এছাড়া চুনাপাথর, জিপসাম, তাম্র, নিকেল, কোবাল্ট ইত্যাদিরও সন্ধান পাওয়া গেছে। তুলনামূলকভাবে কুমায়ুন অঞ্চলের খনিজ পদার্থের উৎপাদন বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়।

প্রধানত যাতায়াতের অসুবিধে এবং প্রয়োজনীয় শিল্পোকরণের অভাব হেতু শিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করতে পারেনি। এখানে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে (ভারতের ১৫ শতাংশ)। বর্তমানে যমুনার উপনদী গিরি প্রকল্প, বিপাশার উপনদী উল প্রকল্প এবং কুমায়ুন অঞ্চলে যমুনা প্রকল্প নিকটবর্তী শহরগুলোতে বিদ্যুৎ সরবরাহ আরম্ভ করেছে।

উভয় অঞ্চলে শিল্পগুলি প্রধানত কৃষিভিত্তিক এবং অরণ্যভিত্তিক। এছাড়া কারিগরি এবং রাসায়নিক শিল্পও কিছু গড়ে উঠেছে। নাহানে একটি ঢালাই ও তারপিন তেলের কারখানা, পোয়ান্তাতে চিনি ও পশম কল, কুলু, মাণ্ডি ও চম্বাতে প্রচুর পশম, শাল, কম্বল ইত্যাদি কুটির শিল্প আকারে বর্তমান। চম্বা, কাংড়া, কুলু, মাণ্ডি এবং সিমলাতে ফলের ওপর নির্ভর করে নানা রকম শিল্প প্রসার লাভ করেছে। এছাড়া কাংড়ার নতুন রেশম শিল্প ও দুন অঞ্চলের বিভিন্ন শহরের চালকল, ময়দাকল উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য কুটির শিল্পের মধ্যে পশমের কাজ, চামড়ার কাজ, কাঠখোদাই ও বাঁশের কাজ ইত্যাদি খ্যাতি লাভ করেছে।

হিমাচল ও কুমায়ুন অঞ্চলের পর্যটন শিল্প ক্রমশ গুরুত্ব লাভ করছে। হিমাচলের কুলু, কাংড়া উপত্যকা, সিমলা, মাণ্ডি, মানালী, ধর্মশালা ও ডালহৌসী এবং কুমায়ুনের মুসৌরী, আলমোড়া ও নৈনিতাল শৈলাবাস এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তীর্থস্থান হিসেবে বদ্রীনাথ, কেদারনাথ, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী ইত্যাদি পর্যটক ও তীর্থযাত্রীদের কাছে বিরাট আকর্ষণ।

যোগাযোগ ব্যবস্থা : ভূপ্রকৃতির বন্ধুরতার জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা খুব উন্নত নয়। হিমাচল অঞ্চলে দুটি মাত্র ছোট রেলপথ (narrow gauge) আছে। একটি কালকা থেকে সিমলা এবং অন্যটি পাঠানকোট থেকে যোগীন্দর নগর পর্যন্ত বিস্তৃত। পূর্বাংশে কালকা থেকে সোলান, সিমলা, রামপুর এবং কল্পা হয়ে একটি জাতীয় সড়ক (NH 22) আরও কিছুটা উত্তর দিকে বিস্তৃত। দক্ষিণাংশে শহরগুলিকে যুক্ত করে পাকা সড়ক আছে। উত্তরাংশে পাকা সড়ক নেই এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত অনুন্নত।

কুমায়ুন অঞ্চলেও যোগাযোগ ব্যবস্থা একই রকম দুর্বল। একমাত্র দেরাদুন পর্যন্ত একটি রেলপথ আছে। এছাড়া দক্ষিণাংশের শহর এবং বড় বড় বসতিগুলির মধ্যে কয়েকটি পাকা সড়ক নির্মিত হয়েছে। উত্তরাংশে প্রধানত তীর্থস্থানগুলিতে যাতায়াতের জন্য কাঁচা সড়ক আছে।

বসতি, শহর ও নগর : গ্রাম্য বসতি সর্বত্র এক ধরনের নয়। উপত্যকা অঞ্চলে বসতি আয়তনে বড় এবং সংখ্যায় বেশি। পর্বতাঞ্চলে বসতি সাধারণত আয়তনে ছোট এবং বিক্ষিপ্ত প্রকৃতির। অনেক স্থানে এক একটি গৃহ বিচ্ছিন্নভাবে গড়ে ওঠে। বৃষ্টি যেখানে কম সেখানে গৃহের দেওয়াল নির্মাণে কর্দম অথবা শিলাখণ্ড

অন্তরায়। অধিকাংশ স্থানে মৃত্তিকার আস্তরণ খুব পাতলা এবং শিলাখণ্ডে পূর্ণ। একমাত্র উপত্যকা অঞ্চলের মৃত্তিকা অপেক্ষাকৃত উর্বর ও দো-আঁশ শ্রেণীর।

মাত্র ১০ শতাংশ ভূমি কৃষিকার্যে নিয়োজিত হলেও হিমাচল অঞ্চলের ৯৩ শতাংশ অধিবাসীর জীবন কৃষিকার্যের ওপর নির্ভরশীল। দুন উপত্যকা ভিন্ন সর্বত্র সোপান চাষ প্রচলিত। পর্বতের ঢাল অনুযায়ী এই সব সোপান বা ধাপে সংকীর্ণ নালা কেটে জল সরবরাহ করা হয়। এই নালাকে 'নহর' বলা হয়। অধিকাংশ স্থানে বছরে একটি মাত্র ফসল জন্মায়। প্রধান ফসলের মধ্যে যথাক্রমে ভুট্টা, গম, ধান, যব, ডাল, জোয়ার ও বাজরা, ছোলা, আলু, ফল এবং আদা উল্লেখযোগ্য। নদী উপত্যকাগুলিতে গম, ভুট্টা, ধান জন্মে থাকে। পাহাড়াঞ্চলে ভুট্টা কিছুটা হয়, কিন্তু উচ্চ পার্বত্যাঞ্চলে জোয়ার ও বাজরা ভিন্ন অন্য ফসল জন্মায় না। কুলু উপত্যকা আপেল উৎপাদনের জন্য বিশেষ খ্যাত। এছাড়া অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে আঙুর, পীচ, ডালিম, লেবু, লিচু ইত্যাদি জন্মে থাকে।

হিমাচল অঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফসল হল চা। কাংড়া উপত্যকা চা চাষের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত।

কুমায়ুন অঞ্চলেও কৃষিকার্য অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা। কৃষিযোগ্য ভূমির অভাব হেতু এখানে সোপান-চাষ প্রচলিত। গম সর্বাপেক্ষা বিস্তীর্ণভাবে উৎপাদিত ফসল; পক্ষান্তরে ধানচাষ উপত্যকা ও নিম্নাঞ্চলে সীমাবদ্ধ। উচ্চভূমিতে বাজরা ও জোয়ার একমাত্র ফসল। পর্বতাঞ্চলে যবও উৎপাদিত হয়। ইক্ষু দুন অঞ্চল ভিন্ন আর কোথাও জন্মায় না। ফলচাষের মধ্যে আলমোড়া, নৈনিতাল, চামোলি এবং মুসৌরীতে আপেল, নাসপাতি, চেরী, আখরোট ও খুবানি প্রচুর পরিমাণে হয়ে থাকে।

উভয় অঞ্চলে পশুপালন জীবিকার একটি প্রধান অঙ্গ। গৃহপালিত পশু-পাখীর মধ্যে গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাঁস ও মুরগী চাষী পরিবারের সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়। সাধারণত পশম, দুধ, সার ও মাংসের জন্য পশুপালন করা হয়। পশুপালকদের ঋতুগত পরিব্রাজন এখানে লক্ষণীয়। কুমায়ুন অঞ্চলের উত্তর-পূর্বাংশে ধউলিগঙ্গা থেকে কালী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে এই ধরনের পশুচারণকে কেন্দ্র করে ভোটীয়া জীবন গড়ে উঠেছে। অধিবাসীদের নাম অনুযায়ী অঞ্চলটিকে ভোটীয়া উপত্যকা বলা হয়।

খনিজ সম্পদ ও শিল্প : খনিজ সম্পদের সম্ভাবনা উজ্জ্বল থাকা সত্ত্বেও এ পর্যন্ত উভয় অঞ্চল খনিজ সম্পদের উৎপাদনে অনগ্রসর। হিমাচল অঞ্চলের মাণ্ডিতে পাথুরে লবণ এবং মাণ্ডি, চম্বা ও কাংড়াতে স্লেট পাথর উত্তোলিত হয়। এছাড়া চুনাপাথর, জিপসাম, তাম্র, নিকেল, কোবাল্ট ইত্যাদিরও সন্ধান পাওয়া গেছে। তুলনামূলকভাবে কুমায়ুন অঞ্চলের খনিজ পদার্থের উৎপাদন বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়।

প্রধানত যাতায়াতের অসুবিধে এবং প্রয়োজনীয় শিল্পোকরণের অভাব হেতু শিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করতে পারেনি। এখানে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে (ভারতের ১৫ শতাংশ)। বর্তমানে যমুনার উপনদী গিরি প্রকল্প, বিপাশার উপনদী উল প্রকল্প এবং কুমায়ুন অঞ্চলে যমুনা প্রকল্প নিকটবর্তী শহরগুলোতে বিদ্যুৎ সরবরাহ আরম্ভ করেছে।

উভয় অঞ্চলে শিল্পগুলি প্রধানত কৃষিভিত্তিক এবং অরণ্যভিত্তিক। এছাড়া কারিগরি এবং রাসায়নিক শিল্পও কিছু গড়ে উঠেছে। নাহানে একটি ঢালাই ও তারপিন তেলের কারখানা, পোয়ান্তাতে চিনি ও পশম কল, কুলু, মাণ্ডি ও চম্বাতে প্রচুর পশম, শাল, কম্বল ইত্যাদি কুটির শিল্প আকারে বর্তমান। চম্বা, কাংড়া, কুলু, মাণ্ডি এবং সিমলাতে ফলের ওপর নির্ভর করে নানা রকম শিল্প প্রসার লাভ করেছে। এছাড়া কাংড়ার নতুন রেশম শিল্প ও দুন অঞ্চলের বিভিন্ন শহরের চালকল, ময়দাকল উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য কুটির শিল্পের মধ্যে পশমের কাজ, চামড়ার কাজ, কাঠখোদাই ও বাঁশের কাজ ইত্যাদি খ্যাতি লাভ করেছে।

হিমাচল ও কুমায়ুন অঞ্চলের পর্যটন শিল্প ক্রমশ গুরুত্ব লাভ করছে। হিমাচলের কুলু, কাংড়া উপত্যকা, সিমলা, মাণ্ডি, মানালী, ধর্মশালা ও ডালহৌসী এবং কুমায়ুনের মুসৌরী, আলমোড়া ও নৈনিতাল শৈলাবাস এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তীর্থস্থান হিসেবে বদ্রীনাথ, কেদারনাথ, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী ইত্যাদি পর্যটক ও তীর্থযাত্রীদের কাছে বিরাট আকর্ষণ।

যোগাযোগ ব্যবস্থা: ভূপ্রকৃতির বন্ধুরতার জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা খুব উন্নত নয়। হিমাচল অঞ্চলে দুটি মাত্র ছোট রেলপথ (narrow gauge) আছে। একটি কালকা থেকে সিমলা এবং অন্যটি পাঠানকোট থেকে যোগীন্দর নগর পর্যন্ত বিস্তৃত। পূর্বাংশে কালকা থেকে সোলান, সিমলা, রামপুর এবং কল্পা হয়ে একটি জাতীয় সড়ক (NH 22) আরও কিছুটা উত্তর দিকে বিস্তৃত। দক্ষিণাংশে শহরগুলিকে যুক্ত করে পাকা সড়ক আছে। উত্তরাংশে পাকা সড়ক নেই এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত অনুন্নত।

কুমায়ুন অঞ্চলেও যোগাযোগ ব্যবস্থা একই রকম দুর্বল। একমাত্র দেরাদুন পর্যন্ত একটি রেলপথ আছে। এছাড়া দক্ষিণাংশের শহর এবং বড় বড় বসতিগুলির মধ্যে কয়েকটি পাকা সড়ক নির্মিত হয়েছে। উত্তরাংশে প্রধানত তীর্থস্থানগুলিতে যাতায়াতের জন্য কাঁচা সড়ক আছে।

বসতি, শহর ও নগর: গ্রাম্য বসতি সর্বত্র এক ধরনের নয়। উপত্যকা অঞ্চলে বসতি আয়তনে বড় এবং সংখ্যায় বেশি। পর্বতাঞ্চলে বসতি সাধারণত আয়তনে ছোট এবং বিক্ষিপ্ত প্রকৃতির। অনেক স্থানে এক একটি গৃহ বিচ্ছিন্নভাবে গড়ে ওঠে। বৃষ্টি যেখানে কম সেখানে গৃহের দেওয়াল নির্মাণে কর্দম অথবা শিলাখণ্ড

ব্যবহৃত হয় এবং বাড়ীর চাল ঢালু হয়। অপেক্ষাকৃত বৃষ্টিবহুল অঞ্চলে বাড়ির ছাদ স্লেট পাথরে তৈরী।
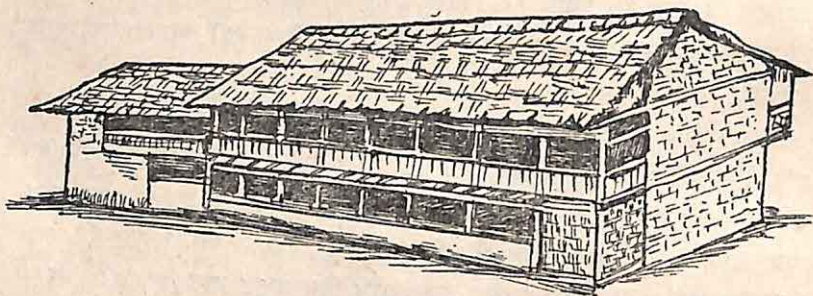
শিলাখণ্ড, কর্দম ও স্লেটের টালির বাড়ী

হিমাচল ও কুমায়ুনের অধিকাংশ শহর আকারে ছোট।

সিমলা (জনসংখ্যা : ৫৫৩৬৮) : হিমাচল রাজ্যের রাজধানী সিমলা এই অঞ্চলের সবচেয়ে বড় শহর। প্রায় ২২০৫ মি উচ্চতায় পাহাড়ের উপর অবস্থিত শহরটি ছোট রেলপথ ও সড়কপথের মাধ্যমে দক্ষিণের সমতলের সঙ্গে যুক্ত। ভারত স্বাধীন হবার আগে সিমলা বড়লাটের গ্রীষ্মকালীন আবাস হিসেবে গড়ে উঠেছিল। বর্তমানে রাজ্যের রাজধানী হিসেবে এখানে অনেক সরকারী অফিস স্থাপিত হয়েছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও জলবায়ুর জন্য সিমলা পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয়।

দেরাদুন (জনসংখ্যা : ১৬৯৮২৭) : কুমায়ুন অঞ্চলের বৃহত্তম নগর দেরাদুন একটি প্রধান যোগাযোগ ও বাণিজ্যকেন্দ্র। শিল্পের দিক থেকেও দেরাদুন খুবই উন্নত। এখানে কয়েকটি পশমকল, কার্পাসকল, রেশমকল এবং কাঠচেরাই কল আছে। তাছাড়া সামরিক শিক্ষাকেন্দ্র, বন-গবেষণাকেন্দ্র, ভারত সরকারের মানচিত্র কার্যালয় ইত্যাদি স্থানটির গুরুত্ব বর্ধিত করেছে।

নৈনিতাল (জনসংখ্যা : ২৩৯৮৬) : গাগার পাহাড়ের একটি হ্রদের চারপাশে এই শহরটি গড়ে উঠেছে। হ্রদের ধারে নয়নাদেবীর মন্দির আছে। নয়নাদেবীর নাম থেকে হ্রদ এবং শহরের নামকরণ হয়েছে। প্রধানত পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে এর খ্যাতি।

আলমোড়া, ল্যান্সডাউন এবং মুসৌরী অন্যান্য পর্যটনকেন্দ্র। হরিদ্বার গঙ্গার তীরে অবস্থিত হিন্দুদের তীর্থস্থানরূপে প্রসিদ্ধ।

(৩) পূর্ব হিমালয়

দার্জিলিং, সিকিম, ভুটান এবং অরুণাচলকে নিয়ে গঠিত পূর্ব হিমালয়ের মোট আয়তন প্রায় ১২২, ৪০২ ব কি। ভূপ্রকৃতির দিক থেকে পশ্চিম ও মধ্য হিমালয়ের

সঙ্গে সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও সংস্কৃতিগত বৈসাদৃশ্য লক্ষণীয়। সিকিম ও ভুটানের অধিবাসীগণ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ও মঙ্গোলজাতীয়। অরুণাচলের অধিবাসীরা মঙ্গোল শ্রেণীর উপজাতি এবং ধর্মের দিক থেকে জৈববাদী। ধর্ম, ভাষা, জীবনধারণের রীতিনীতিতে পূর্ব হিমালয় স্বাতন্ত্র্যের দাবী রাখে।

(সিকিম ও ভুটান স্বাধীন রাজ্য হওয়াতে ঐ দুটি রাজ্যের আলোচনা বাদ দেওয়া হল)।

ভূপ্রকৃতি ও নদনদী: হিমালয়ের মূল শাখাগুলি পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে প্রসারিত হয়ে অরুণাচলে দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে বেঁকে গেছে। উত্তর থেকে দক্ষিণে পর পর হিমাদ্রি, হিমাচল এবং শিবালিক পর্বতের শাখা বিস্তৃত। কিন্তু শিবালিক পর্বতের একটানা বিস্তৃতি এখানে ব্যাহত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৯০ কি স্থান জুড়ে শিবালিক পর্বত অবর্তমান।
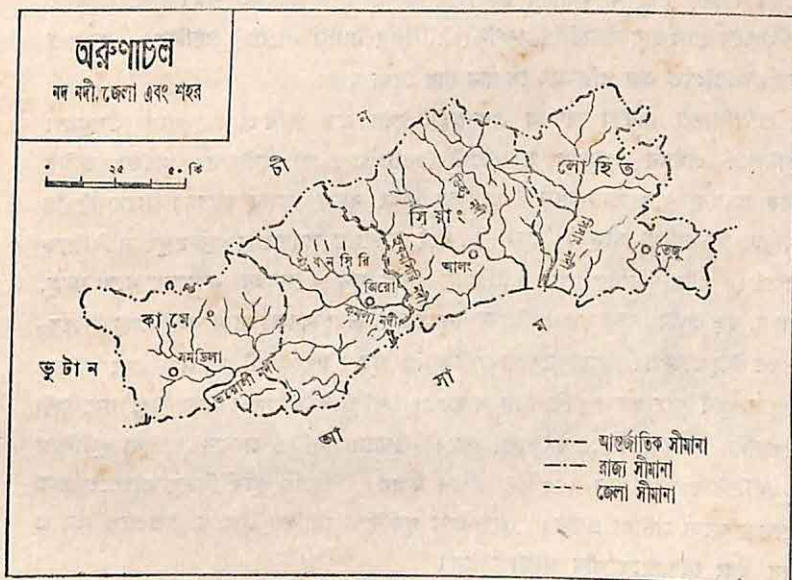
মানচিত্র ৮

সমগ্র অঞ্চলটি হিমালয় থেকে উদ্ভূত অসংখ্য নদী ও তাদের শাখা-প্রশাখা দ্বারা গভীরভাবে ব্যবচ্ছেদিত হয়েছে। নদীপথে অনেক গিরিখাত দেখা যায়। এইসব নদীর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের তিস্তা, জলঢাকা ও তোরসা এবং অরুণাচলের ডিহং, কমলা, সুবর্ণগিরি ও সিসাং উল্লেখযোগ্য (মানচিত্র ৮)। সব নদীগুলি শেষ পর্যন্ত সমতলে এসে ব্রহ্মপুত্রতে গিয়ে মিশেছে।

জলবায়ু : পর্বতের উচ্চতা অনুসারে তাপমাত্রার তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। এই অঞ্চলে গ্রীষ্মকাল স্বল্পস্থায়ী এবং মাঝে মাঝে বৃষ্টিপাতের ফলে গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রা কম। সাধারণত গ্রীষ্মকালে গড় তাপমাত্রা ৩৮ সে। শীতকালে শীতের তীব্রতা সর্বত্র অনুভূত হয়। দক্ষিণাংশে তাপাঙ্ক হিমাঙ্কের কাছাকাছি থাকে কিন্তু উত্তরাংশে তা অনেক নিচে নেমে যায়। মার্চের শেষ দিক থেকে বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে যায় এবং মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বৃষ্টিপাত চলতে থাকে। এছাড়া শীতকালেও বৃষ্টিপাত হয়। সাধারণত ১৫০০ মিটারের উর্ধ্বে বৃষ্টির পরিবর্তে তুষারপাত ঘটে থাকে। মোট বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (১০০-৪০০ সেমি) মধ্য হিমালয় থেকে অনেক বেশি।

কৃষিকার্য : অধিবাসীদের প্রায় ৯০ শতাংশের ক্ষেত্রে কৃষিকার্য জীবনধারণের একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু অন্যান্য পার্বত্য অঞ্চলের কৃষি এখানে ততটা উন্নত নয়। যেমন নিবিড় চাষ বা সোপান চাষ এই অঞ্চলে খুব প্রচলিত নয়। অরুণাচলের অধিকাংশ স্থানে স্থানপরিবর্তনশীল কৃষি (shifting cultivation) প্রচলিত। একমাত্র উপত্যকাগুলিতে অল্প পরিমাণে সোপান চাষ দেখা যায়।

দার্জিলিঙের পার্বত্য অঞ্চলে এক-চতুর্থাংশের মত জমি চাষের পক্ষে উপযুক্ত। কৃষিকার্য এখানে প্রধানত স্বয়ংভোগী (subsistence) পর্যায়ের। কর্ষিত জমির প্রায় অর্ধেক ধান উৎপাদনে নিয়োজিত এবং ধানই প্রধান ফসল। সমপরিমাণ জমিতে চা-বাগিচা গড়ে উঠেছে। চা এই অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক ফসল। খাদ্য-ফসলের মধ্যে এর পরই ভুট্টার স্থান। অন্যান্য ফসলের মধ্যে আলু, আদা, বড় এলাচ, নানা রকম শীতকালীন সবজি, এবং ফলের মধ্যে কমলালেবু বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অরুণাচলের কৃষিকার্যও মূলত স্বয়ংভোগী পর্যায়ের এবং পশ্চিম থেকে পূর্বে ফসলের প্রকৃতি ভিন্ন ধরনের। পশ্চিমে কামেং জেলায় যব, গম, ভুট্টা ইত্যাদির তুলনায় ধানের উৎপাদন কম। এখানে সবজিও জন্মায়। কিন্তু পূর্বদিকে সুবর্ণগিরি জেলায় ধান এবং ভুট্টা প্রধান ফসল। আরও পূর্বে সিয়াং জেলাতে দানা শস্যের মধ্যে সরিষা প্রধান। একেবারে পূর্বদিকে লোহিত জেলার উচ্চভাগে গম ও যব এবং নিম্নাংশে ধান প্রধান ফসল।

সমগ্র অঞ্চলটিতে জীবিকা হিসেবে পশুচারণ তেমন প্রসার লাভ করেনি।

খনিজসম্পদ ও শিল্প : ভূবিজ্ঞানীদের মতে এই অঞ্চলে নানা রকম খনিজসম্পদ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সন্ধানকার্য আজও সম্পূর্ণ হয়নি। দার্জিলিং হিমালয়ে কয়লা, লৌহ, তাম্র, গ্রাফাইট, ফিলাইট, চীনামাটির বাসন তৈরি উপযুক্ত শ্বেত কর্দম (white clay) ইত্যাদির সন্ধান পাওয়া গেছে। একমাত্র কয়লা ভিন্ন বাকিগুলির অর্থনৈতিক উৎপাদন এখনও আরম্ভ হয়নি।

চা ব্যতীত অন্য কোন বড় শিল্প আজ পর্যন্ত স্থাপিত হয়নি। এখানে অনেকগুলি

চা তৈরির কারখানা আছে। কুটির শিল্প পর্যায়ে বস্ত্রবয়ন, মেয়েদের হাতব্যাগ তৈরির কাজ, সূচীশিল্প, কাঠখোদাই, নানা রকম কারু শিল্প, দুগ্ধজাতদ্রব্য শিল্প, রেশমের গুটি শিল্প ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

অরুণাচলে খনিজ দ্রব্যের উৎপাদন এখনও আরম্ভ হয়নি। শিল্পও এখানে প্রকৃত অর্থে গড়ে ওঠেনি। শিল্প বলতে যা বোঝায় তা ঘরে ঘরে তাঁত, বাঁশ ও বেতের কাজ ইত্যাদি। তাঁতবস্ত্র এবং হাতের কাজে দক্ষতা এবং অপূর্ব রুচির পরিচয় পাওয়া যায়।

যোগাযোগ ব্যবস্থা : দার্জিলিঙের যোগাযোগ ব্যবস্থা অরুণাচল অপেক্ষা অনেক উন্নত। শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলি পর্যন্ত একটি ছোট রেলপথ আছে। এছাড়া কয়েকটি পাকা সড়কের মারফৎ দার্জিলিং এবং তার আশেপাশের অঞ্চল সমতলের সাথে যুক্ত। অরুণাচলে কোন রেলপথ নেই। এখানকার প্রধান স্থানগুলি ছোট ছোট সড়কের মাধ্যমে দক্ষিণের সমভূমির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে।

বসতি, শহর ও নগর : পূর্ব হিমালয় তুলনামূলক বিচারে সর্বাপেক্ষা জনবিরল অঞ্চল। এখানে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে মাত্র ১৪ জন লোকের বাস। অধিবাসীদের
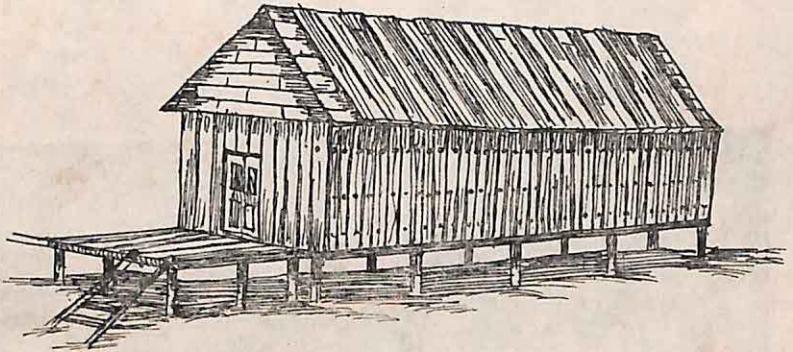
অরুণাচলের কাঠের বাড়ি

বৃহত্তম অংশ গ্রামবাসী। শহরের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। ভূমির বন্ধুরতা এবং অরণ্যের গভীরতার জন্য বসতিগুলি অত্যন্ত বিচ্ছিন্নভাবে গড়ে উঠেছে। অধিকাংশ বসতি আয়তনে ক্ষুদ্র এবং কোথাও কোথাও তা কয়েকটি গৃহের সমষ্টি থেকে একটি গৃহে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। গৃহনির্মাণে দার্জিলিং অঞ্চলে শিলাখণ্ড এবং কাঠের ব্যবহার খুবই প্রচলিত। অরুণাচলে কাঠের বাড়ি বেশি দেখা যায়। অরণ্যাঞ্চলে মাচানের মত কাঠের খুঁটির ওপর বাড়ি নির্মিত হয়।

শহর হিসেবে দার্জিলিং, কালিম্পং এবং কার্শিয়াং উল্লেখযোগ্য। অরুণাচলে মোট চারটি ক্ষুদ্র শহর আছে; যেমন—বমডিলা, পাসিঘাট, আলঙ এবং চেবু। এখানকার রাজধানী ইটানগর ভবিষ্যতে একটি প্রধান শহর রূপে গড়ে উঠবে। বর্তমানে শহরগুলির মিলিত লোকসংখ্যা মাত্র ১৭২৮৮ (১৯৭১)।
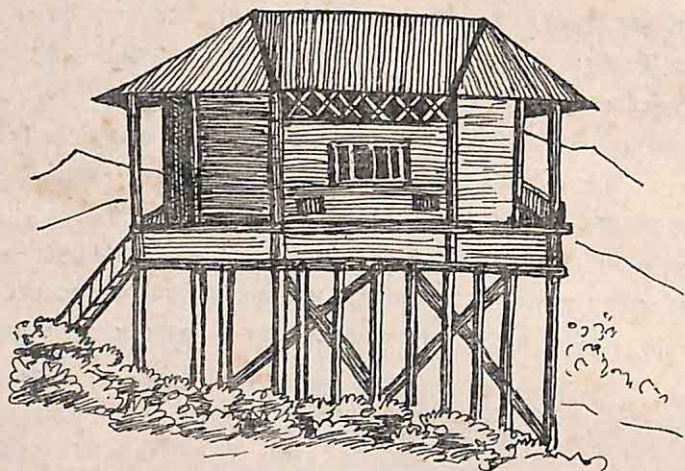
অরুণাচলে খুঁটির ওপর কাঠের বাড়ী

দার্জিলিং সান্দাকফু থেকে এভারেস্টের দৃশ্য

দার্জিলিং (জনসংখ্যা : ৪২৮৭৩) : সমুদ্রাঙ্ক থেকে প্রায় ২৩০০ মিটার উচ্চে অবস্থিত দার্জিলিং শহর এই জেলার প্রশাসনিক কেন্দ্র এবং পশ্চিমবঙ্গের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী। নৈসর্গিক শোভা, মনোরম জলবায়ু, কাঞ্চনজঙ্ঘার অপূর্ব দৃশ্য ইত্যাদি আকর্ষণ শহরটিকে ভারতের একটি প্রধান পর্যটনকেন্দ্রে রূপান্তরিত করেছে। গ্রীষ্মকাল থেকে শীতকালের প্রারম্ভ পর্যন্ত এখানে প্রতি বছর কয়েক লক্ষ দেশী-বিদেশী পর্যটকের ভীড় হয়। অজস্র হোটেল, ভালো ভালো দোকানপাট, বিভিন্ন সরকারী অফিস, কয়েকটি বিখ্যাত মিশনারী স্কুল ও কলেজ দার্জিলিং শহরকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছে। পার্বত্যাঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার ব্যাপারে শহরটি প্রধান নার্ভ-কেন্দ্রের ভূমিকা নিয়েছে।

কালিম্পং (জনসংখ্যা : ২৩৪৩০) এবং কার্শিয়াং (জনসংখ্যা : ১৫৪২৫) অপর দুটি শৈলশহর। শিক্ষাকেন্দ্র এবং পর্যটনকেন্দ্ররূপেও এদের প্রাধান্য রয়েছে।
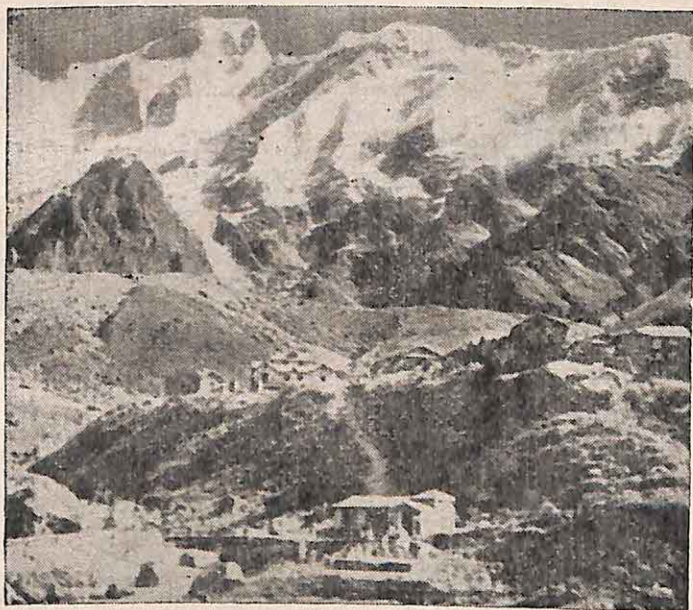
হিমালয়ের একটি গ্রাম

তৃতীয় অধ্যায়

উত্তর-পূর্বের পার্বত্য রাজ্য

উত্তর-পূর্বের পার্বত্য রাজ্যের অন্তর্গত মেঘালয়, নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর এবং ত্রিপুরা নামে চারটি পৃথক রাজ্যের সম্মিলিত আয়তন ৭১৮৪৯ ব কি। আসাম রাজ্যের দক্ষিণের প্রলম্বিত অংশ মেঘালয়কে নাগাল্যাণ্ড এবং মণিপুর থেকে পৃথক করেছে। মেঘালয় এবং নাগাল্যাণ্ডের উত্তরে আসাম রাজ্য। এই দুটি রাজ্যই পূর্বে আসামের অংশ ছিল। মেঘালয়ের পশ্চিমে এবং দক্ষিণে বাংলাদেশ। ত্রিপুরা রাজ্য একমাত্র উত্তর-পূর্বদিক ভিন্ন সবদিকে বাংলাদেশ দ্বারা বেষ্টিত। নাগাল্যাণ্ড এবং মণিপুরের পূর্বে ব্রহ্মদেশ।

মেঘালয়

আঞ্চলিক দাবীর ভিত্তিতে ১৯৭২ সালের ২১শে জানুয়ারি ব্রহ্মপুত্র নদীর দক্ষিণে অবস্থিত গারো, খাসি ও জয়ন্তীয়া পাহাড়কে নিয়ে এই নতুন রাজ্যটির সৃষ্টি হয়। বছরের বেশির ভাগ সময় মেঘে ঢাকা থাকে বলে বিখ্যাত ভৌগোলিক শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের দেওয়া নাম থেকে এই রাজ্যের নাম হয়েছে মেঘালয়।
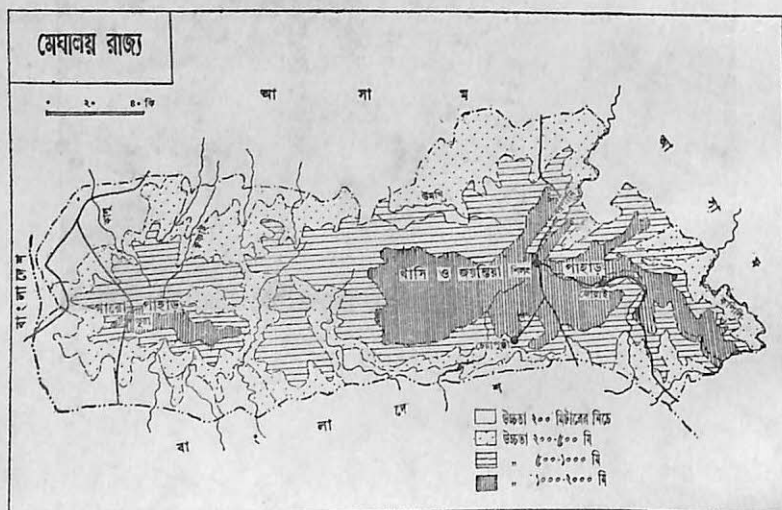
মানচিত্র ৯

মেঘালয়ের উত্তরে এবং পূর্বে আসাম এবং পশ্চিমে ও দক্ষিণে বাংলাদেশ। এই রাজ্যের মোট আয়তন ২২৪৮৯ ব কি এবং এর অধিবাসীর সংখ্যা মাত্র ১,০১১,৬৯৯ (১৯৭১) (মানচিত্র ৯)।

ভূপ্রকৃতি ও নদ-নদী: নামে পাহাড় হলেও মেঘালয় আসলে একটি অবক্ষয়িত মালভূমি এবং ভারতের দাক্ষিণাত্যের মালভূমির একটি বিচ্ছিন্ন অংশ। হিমালয়ের জন্মের পূর্বে এই অঞ্চলের অধিকাংশ কিছুকাল টেথীস সমুদ্রের জলে ডুবে ছিল এবং পরে হিমালয়ের অভ্যুত্থানের সময় সমগ্র অঞ্চলটি আবার ধীরে ধীরে উত্থিত হয়। নিমজ্জমান অবস্থায় স্তরে স্তরে পলল সঞ্চয়নের চিহ্ন আজও মালভূমির পশ্চিম ও দক্ষিণ প্রান্তে দেখা যায়। মালভূমির পশ্চিমাংশে গারো পাহাড় এবং মধ্য ও পূর্বাংশে খাসি ও জয়ন্তীয়া পাহাড়। পাহাড়ের শীর্ষদেশ সর্বত্র সমতল হয়ে এসেছে। অঞ্চলের মধ্যভাগে মালভূমির উচ্চতা সর্বাধিক (১৯৬১ মি); উত্তর ও দক্ষিণে উচ্চতা কমে এসেছে। দক্ষিণ দিকে মালভূমি দেওয়ালের মত খাড়া ভাবে নেমে বাংলাদেশের সুরমা উপত্যকার সঙ্গে হঠাৎ মিশে গেছে।

মালভূমি থেকে উৎপন্ন নদীগুলি আকারে ছোট হলেও খরস্রোতা। নদীগুলি উত্তরে ব্রহ্মপুত্র ও দক্ষিণে সুরমা উপত্যকায় গিয়ে পড়েছে। গারো পাহাড় থেকে উৎপন্ন নদী কৃষ্ণাই এবং কালু নাব্য। খাসি ও জয়ন্তীয়া পাহাড় থেকে উৎপন্ন নদীর মধ্যে উমখ্রি, দিগারু এবং উমিয়ামের নাম করা যেতে পারে।

জলবায়ু: প্রধানত উচ্চতার জন্য এখানকার জলবায়ু ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার তুলনায় অপেক্ষাকৃত মনোরম। পশ্চিমাংশে তাপ পূর্বাংশ অপেক্ষা বেশি। অধিকতর উচ্চতার জন্য পূর্বাংশে শীত তীব্রতর। শিলঙের তাপাঙ্ক ১·৭° সে।

মেঘালয়ে বৃষ্টির পরিমাণ অত্যধিক, যদিও তার মাত্রা সর্বত্র একরকম নয়। পশ্চিম মেঘালয়ে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২৭০ সে এবং তার অধিকাংশ মৌসুমীবায়ু থেকে গ্রীষ্মকালে হয়ে থাকে। মধ্য এবং পূর্ব দিকে বৃষ্টির পরিমাণ আরও বেশি। মালভূমির দক্ষিণপ্রান্তে অবস্থিত চেরাপুঞ্জী এবং ১৬ কি পশ্চিমে অবস্থিত মউসীনরামে যথাক্রমে ১২০৩ ও ১৩৯২ সে বৃষ্টিপাত হয়। এ দুটি পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃষ্টিবহুল স্থান। দক্ষিণে সুরমা উপত্যকার ওপর দিয়ে আসা প্রচুর জলকণাসম্পৃক্ত মৌসুমীবায়ু হঠাৎ এখানে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে প্রবল বর্ষণ ঘটিয়ে থাকে। সে তুলনায় শিলং বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চলে অবস্থিত হওয়াতে ঐ স্থানে মাত্র ৩০৭ সে বৃষ্টিপাত হয়।

স্বাভাবিক উদ্ভিদ: মালভূমির মধ্য ও পূর্বভাগের উচ্চতম অংশে পাইন, উইলো, বার্চ, ওক, বীচ ইত্যাদি সরলবর্গীয় বৃক্ষ দেখা যায়। নিচের দিকে শাল, চাপ, গামারী ইত্যাদি বৃক্ষ এবং নানা জাতীয় ঘাস জন্মায়। দক্ষিণ দিকে বৃষ্টিবহুল স্থানে অবিরত মৃত্তিকা ক্ষয়ের ফলে উদ্ভিদ প্রায় নেই। মালভূমির পশ্চিমাংশে অরণ্য অনেক ঘন

এবং মিশ্র ক্রান্তীয় শ্রেণীর। শাল প্রধান বৃক্ষ। এছাড়া বাঁশ এবং বেত উল্লেখযোগ্য সম্পদ।

কৃষিকার্য : অধিবাসীদের ৮০ শতাংশ কৃষিকার্যের ওপর নির্ভরশীল। এখানকার কৃষিব্যবস্থা প্রধানত স্থানপরিবর্তনশীল বা ঝুম শ্রেণীর। কেবল খাসি ও জয়ন্তীয়া পাহাড়াঞ্চলের নদী উপত্যকার কোন কোন স্থানে সোপান চাষ কিছুটা প্রচলিত।

সমগ্র অঞ্চলে ফসলের মধ্যে ধানের স্থান প্রথম। মধ্য ও পূর্বাংশে ধানের পর আলু, ভুট্টা, সুপারী এবং ফল প্রধান ফসল। পশ্চিমাংশের অপেক্ষাকৃত নিম্ন নদী উপত্যকায় ধান, পাট, ইক্ষু, ছোলা, ডাল, সরিষা, তামাক এবং আলুর চাষ হয়। পাহাড়ে ঝুম চাষের মাধ্যমে ধান, তুলো, জোয়ার ও বাজরা, ভুট্টা, আদা, লংকা, পান এবং নানা রকম ফলের মধ্যে আনারস, কমলালেবু ইত্যাদি উৎপাদিত হয়। এছাড়া পশ্চিম মেঘালয়ে নীল এবং লাক্ষার বিস্তৃত চাষ দেখা যায়।

মেঘালয়ে জীবিকা হিসেবে পশুপালন তেমন জনপ্রিয় নয়। প্রধানত ভারবাহী পশু হিসেবে গরু এবং মোষ এবং মাংস ও জমির সারের চাহিদা পূরণের জন্য ঐসব পশু ছাড়াও ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি প্রতিপালিত হয়। এই অঞ্চলের অধিবাসীরা সাধারণত দুধের জন্য গরু-মোষ রাখে না।

খনিজ সম্পদ ও শিল্প : মেঘালয় খনিজ সম্পদে যথেষ্ট সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও কয়লা, চুনাপাথর এবং সিলিমেনাইট ব্যতীত অন্য কোন পদার্থের উৎপাদন এখনও আরম্ভ হয়নি। গারো এবং খাসি পাহাড়ে কয়লা, গারো থেকে খাসি-জয়ন্তীয়া পর্যন্ত বিস্তৃত চুনাপাথর বলয়ে চুনাপাথর, ও খাসি পাহাড়ে সিলিমেনাইট পাওয়া যায়। এছাড়া চীনামাটি, কাঁচ তৈরির উপযুক্ত বালি, লৌহ, তাম্র, স্বর্ণ এবং জিপসামের সন্ধান পাওয়া গেছে।

প্রকৃত অর্থে শিল্প এখনও কোথাও গড়ে ওঠেনি। চেরাপুঞ্জীতে স্থানীয় কয়লাকে কোকে রূপান্তরিত করে শিলঙে পাঠানো হচ্ছে। তাছাড়া এখানে একটি ছোট সিমেন্ট কারখানা আছে! উমক্রু এবং উমিয়াম ও কাপিলি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ নিকটবর্তী শহরাঞ্চলে ব্যবহৃত হচ্ছে। অন্যান্য শিল্প এখনও কুটির শিল্প পর্যায়ে রয়ে গেছে। স্থানীয় তুলো থেকে মোটা সূতীবস্ত্র, বাঁশের এবং বেতের কাজ, কাঠের কাজ, লাক্ষা তৈরি ইত্যাদি কুটির শিল্পের আকারে গড়ে উঠেছে।

যোগাযোগ ব্যবস্থা : ভূপ্রকৃতি এবং অনুন্নত অর্থনীতির জন্য এখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা খুব দুর্বল। পশ্চিমাংশে ডালু থেকে একটি সড়ক তুরা হয়ে উত্তর দিকে সমভূমির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করছে। পূর্বাংশে উত্তরের সমভূমি থেকে আর একটি পাকা সড়ক শিলং হয়ে চেরাপুঞ্জী এবং শিলং থেকে একটি শাখা জোয়াই হয়ে মেঘালয়ের সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত। এছাড়া পাকা সড়ক আর কোথাও নেই। উত্তর সীমান্ত রেলপথের একটি শাখা দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তের ভেতর দিয়ে গেছে।

বসতি, শহর ও নগর: ভূমির বন্ধুরতা, মৃত্তিকাক্ষয় এবং কৃষিযোগ্য ভূমির অভাব হেতু বসতিগুলি বিক্ষিপ্ত ভাবে গড়ে উঠেছে। অধিকাংশ গ্রাম আয়তনে ক্ষুদ্র এবং তাদের লোকসংখ্যা খুব কম। সাধারণত মালভূমির মৃদু ঢালে এবং পাহাড়ের মধ্যবর্তী উপত্যকায় বসতিগুলি গড়ে উঠেছে। উপজাতীয় রীতি অনুযায়ী বিভিন্ন পরিবারের গৃহগুলি দেওয়াল দ্বারা পরস্পর থেকে পৃথক। বাড়ির চাল, দেওয়াল এবং মেঝে নির্মাণে কাঠের প্রচলন বেশি। গারো পাহাড়ে গৃহগুলি সাধারণত খের ও নাড়া জাতীয় ঘাস এবং টকু পাতায় আচ্ছাদিত।

শিলং (জনসংখ্যা: ৮৭৬৫৯): মেঘালয়ের রাজধানী শিলং একমাত্র উল্লেখযোগ্য শহর। অপরূপ প্রাকৃতিক শোভা ও মনোরম জলবায়ুর জন্য শিলং পর্যটকদের কাছে খুব আকর্ষণীয়। এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে।

জোয়াই এবং তুরা শহর হিসেবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়।

নাগাল্যাণ্ড

অবস্থান: ১৯৬৪ সালে সৃষ্ট নাগাল্যাণ্ড পূর্বে আসাম প্রদেশের অন্তর্গত ছিল। পশ্চিম দিকে আসাম, উত্তরে আসাম ও অরুণাচল, পূর্বে ব্রহ্মদেশ এবং দক্ষিণে মণিপুর নাগাল্যাণ্ডকে সীমান্ত রাজ্যের মর্যাদা দিয়েছে। এই রাজ্যের আয়তন ১৬৫২৭ ব কি এবং লোকসংখ্যা ৫১৬,৪৪৯ (১৯৭১)। (মানচিত্র ১০)।

ভূপ্রকৃতি ও জলবায়ু: উত্তরের হিমালয় পর্বতশ্রেণী লোহিত নদী অতিক্রম করার পর হঠাৎ দক্ষিণমুখী বাঁক নিয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রসারিত কয়েকটি সমান্তরাল পাহাড় ও অন্তর্বর্তী উপত্যকার সৃষ্টি করেছে। নাগাল্যাণ্ডের পশ্চিম এবং পূর্ব সীমানা বরাবর যথাক্রমে কোহিমা পাহাড় ও নাগা পাহাড় উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রসারিত। দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে বরাইল পাহাড় এই রাজ্যে প্রবেশ করে কোহিমা পর্যন্ত বিস্তৃত। নাগা পাহাড় ভারত ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে প্রধান জলবিভাজিকার কাজ করছে। বরাইলের উচ্চতম শৃঙ্গের উচ্চতা ২৯৭০ মি; নাগা পাহাড়ে কয়েকটি শৃঙ্গের উচ্চতা ৩০০০ মিটারের উর্ধ্বে।

পাহাড়ের বিন্যাস অনুযায়ী নদীগুলি উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত। বরাক, দিখু এবং লানিয়া এখানকার প্রধান নদী। দিখু উত্তর দিকে ব্রহ্মপুত্রে গিয়ে পড়েছে; বরাক এবং লানিয়া দক্ষিণবাহিনী।

জলবায়ু: উচ্চতা এবং পাহাড়ের উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রসার এখানকার জলবায়ুর ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। গ্রীষ্ম প্রখর নয়; কিন্তু শীতের তীব্রতা বেশ অনুভূত হয়। বৃষ্টিপাত প্রধানত মৌসুমীবায়ু থেকে হয়ে থাকে। এখানে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৫০ সেন্টিমিটারের উর্ধ্বে।

স্বাভাবিক উদ্ভিদ: উচ্চতার তারতম্য অনুযায়ী উদ্ভিদের প্রকৃতি পরিবর্তিত হতে

মানচিত্র ১০

দেখা যায়। ১৮০০ মিটারের উর্ধ্বে সরলবর্গীয় অরণ্য ওক, চেস্টনাট, বার্চ, মেপল ইত্যাদি বৃক্ষে পূর্ণ। অপেক্ষাকৃত নিম্নাংশে নানা রকম পর্ণমোচী বৃক্ষ এবং বাঁশ সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

কৃষিকার্য: অধিবাসীদের মূল জীবিকা কৃষিকার্য, যদিও এই পাহাড়ী রাজ্যের মাত্র ৪০ শতাংশ ভূমি কৃষিকার্যের পক্ষে উপযক্ত। রাজ্যের মোট তিনটি জেলার মধ্যে উত্তরের মকককুঙ ও তুয়েনসাঙ জেলার ৮০ শতাংশ চাষের জমিতে ঝুম কৃষি প্রচলিত। একমাত্র দক্ষিণের কোহিমা জেলায় ঝুম চাষ অপেক্ষা সোপান চাষ অধিকতর জনপ্রিয়। সোপান চাষের জন্য জলসেচের ব্যবস্থা আছে। পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট নালা কেটে এক ধাপ থেকে অন্য ধাপে জল নিয়ে যাওয়া হয়। উভয় ক্ষেত্রে ধানই প্রধান

ফসল। ঝুম চাষের মাধ্যমে ধান ব্যতীত অন্যান্য ফসলের মধ্যে তুলো, আলু, লংকা, আদা, ডাল এবং নানা রকম সবজি ফলানো হয়। এছাড়া এখানে তেজপাতা ও চা উৎপাদিত হয়ে থাকে।

খনিজ সম্পদ ও শিল্প: নাগাল্যাণ্ড খনিজ সম্পদে খুব দরিদ্র। এখানে এক ধরনের চন, কিছু পরিমাণ লিগনাইট এবং কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে।

ইতিমধ্যে এই রাজ্যে কয়েকটি মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে উঠেছে। ডিমাপুরে একটি চিনির কল এবং কাঠ শোধনের কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। মককচুঙে একটি রেশম তৈরির কারখানা আছে। নাগাল্যাণ্ডের আসল খ্যাতি বস্ত্রবয়নে। বস্ত্রবয়ন এই অঞ্চলের মহিলাদের পারিবারিক পেশা এবং শিল্প-সৌকর্যের জন্য এদের তৈরি শাল, বিছানার চাদর, মেয়েদের হাত ব্যাগ, টাই, বস্ত্রখণ্ড ইত্যাদির খুব চাহিদা আছে।

যোগাযোগ ব্যবস্থা: অধিকাংশ স্থানে যাতায়াতের কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই। জাতীয় সড়কের মাধ্যমে কোহিমা এবং ডিমাপুর প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে।

বসতি, শহর ও নগর: প্রধানত কৃষিকার্যের ওপর নির্ভরশীল এরাজ্যের ৯০ শতাংশ অধিবাসী গ্রামে বাস করে। সাধারণত পাহাড়ের শীর্ষদেশে গ্রামগুলি অবস্থিত। প্রতিটি গ্রাম চারপাশে বাঁশ অথবা কাঠের প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত। গৃহগুলি বৃহৎ কানাযুক্ত এবং প্রচণ্ড হাওয়া প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে ছাদ অনেক ক্ষেত্রে প্রলম্বিত হয়ে মাটি পর্যন্ত নেমে আসে। পাহাড়ের ঢালে গৃহের কিছুটা অংশ মাচা-আকারে
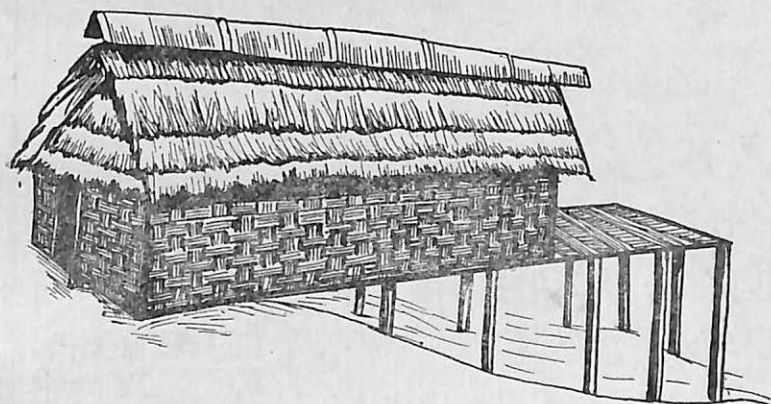
নাগাল্যাণ্ডের বাঁশের খুটির ওপর মাচাগৃহ

থাকে। গৃহনির্মাণে ঘাস এবং বাঁশের ব্যবহার খুব প্রচলিত। মেঝের জন্য কাঠ ব্যবহৃত হয়।

এখানে মোট তিনটি শহর আছে; যেমন—কোহিমা, মককচুঙ এবং ডিমাপুর। কোহিমা (জনসংখ্যা: ২১,৫৪৫): রাজ্যের রাজধানী এবং সর্বাপেক্ষা বৃহৎ শহর। সড়কপথের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবসা-বাণিজ্যের একমাত্র কেন্দ্র।

মণিপুর

এককালের করদরাজ্য মণিপুর ভারত স্বাধীন হবার পর কিছুকাল কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল হিসেবে থাকার পর ১৯৭২ সালের ২১শে জানুয়ারি পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের মর্যাদা পেয়েছে।

অবস্থান: উত্তরে নাগাল্যাণ্ড, পশ্চিমে আসাম, দক্ষিণে মিজোরাম ও ব্রহ্মদেশ এবং পূর্বে ব্রহ্মদেশ মণিপুরের অবস্থানকে রাজনৈতিক বিচারে গুরুত্ব দিয়েছে। এ

মানচিত্র ১১

রাজ্যের মোট আয়তন ২২,৩৫৬ ব. মি এবং এর লোকসংখ্যা ১,০৭২,৭৫৩ (১৯৭১)। (মানচিত্র ১১)।

ভূপ্রকৃতি ও নদনদী: এই রাজ্যের প্রায় ৯২ শতাংশ ভূভাগ পর্বতময়। উত্তর থেকে দক্ষিণে সমান্তরাল পাহাড়শ্রেণী এবং তাদের অন্তর্বর্তী ক্ষুদ্র নদী উপত্যকা এখানকার ভূপ্রকৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। পাহাড়গুলি ৯০০ থেকে ২১০০ মি পর্যন্ত উঁচ। রাজ্যের মধ্যভাগে প্রায় ৩৯০ ব কি আয়তনবিশিষ্ট 'ইম্ফল অবতল' (Imphal Basin) কাশ্মীর ও নেপাল উপত্যকার মত একটি প্রাচীন হ্রদ থেকে জন্মলাভ করেছে। হ্রদের জল বেরিয়ে গিয়ে সমভূমির সৃষ্টি হয়েছে এবং ঐ হ্রদের একটি ছোট অংশ 'লোকটাক' হ্রদ নামে ইম্ফল শহরের দক্ষিণে আজও বর্তমান।

এখানে নদীগুলি উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত। পশ্চিমাংশে প্রবাহিত বরাক মণিপুরের প্রধান নদী। আসামের কাছাড় জেলার ভেতর দিয়ে বরাক সুরমা উপত্যকায় প্রবেশ করেছে। উত্তরের পাহাড় থেকে জন্মলাভ করে মণিপুর নদী লোকটাক হ্রদ হয়ে আরও দক্ষিণে রাজ্যের সীমানা অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মদেশের ছিন্দুইন নদীতে পতিত হয়েছে। বরাক এবং মণিপুর নদী নাব্য। রাজ্যের অন্যান্য নদীগুলি খুবই ছোট এবং অস্থায়ী।

জলবায়ু: ডিসেম্বরের প্রারম্ভ থেকে শীতের তীব্রতা অনুভূত হয়। পাহাড়াঞ্চলে শীত অনেক বেশি। স্থানে স্থানে তাপাঙ্ক 0° সে। শীতকালে ইম্ফল অবতলে ঘন কুয়াশার সৃষ্টি হয়। অবতল অঞ্চলে গ্রীষ্ম প্রখরতর। উত্তাপ ৪০° সেন্টিগ্রেড ছাড়িয়ে যায়। মে মাস থেকে বর্ষাকালের সূচনা হয় এবং দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী-বায়ু থেকে বছরের অধিকাংশ পরিমাণ বৃষ্টিপাত ঘটে থাকে। পাহাড়ের উচ্চতা এবং ঢাল অনুসারে বৃষ্টির পরিমাণে তারতম্য দেখা যায়। পশ্চিমাংশে পাহাড়াঞ্চলে বৃষ্টির পরিমাণ সর্বাধিক। এখানে ১৫০-২০০ সেন্টিমিটার বৃষ্টি হয়। ইম্ফলে বৃষ্টির পরিমাণ ১৪৩ সেন্টিমিটার।

স্বাভাবিক উদ্ভিদ: পাহাড়াঞ্চলে উদ্ভিদের প্রকৃতি নাগাল্যাণ্ডের অনুরূপ। তবে ঝুম চাষের ফলে পাহাড়াঞ্চলে একমাত্র বাঁশ ব্যতীত অন্য কোন স্থায়ী উদ্ভিদ জন্মাতে পারে না। রাজ্যের মোট প্রায় ২৬০০ ব কি ভূমিতে বাঁশ প্রধান উদ্ভিদ এবং ক্রমশ তা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। পশ্চিমে বরাক নদীর অববাহিকা এবং দক্ষিণাঞ্চলে বাঁশের প্রাধান্য দেখা যায়। ইম্ফল অবতলে ঘাস এবং নলখাগড়া জাতীয় উদ্ভিদ প্রধান।

কৃষিকার্য: রাজ্যের প্রায় ৮৪ শতাংশ অধিবাসীর ক্ষেত্রে কৃষিকার্য জীবনধারণের প্রধান অবলম্বন। ইম্ফল অবতলের মৃত্তিকা হ্রদ ও নদী থেকে জন্মলাভ করাতে খুবই উর্বর। পাহাড়াঞ্চলে প্রধানত লাল দো-আঁশ শ্রেণীর মৃত্তিকা এবং পাহাড়ের নিচের দিকে নুড়ি ও শিলাখণ্ডে পূর্ণ মৃত্তিকা দেখা যায়। ব্রহ্মদেশ সীমান্তে ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা রয়েছে।

ইম্ফল অবতলে মণিপুর নদীর জল সেচকার্যে ব্যবহৃত হয়। এখানে নিবিড় চাষ প্রচলিত। অবতলের অর্ধেক জমিতে কৃষিকার্য হয়ে থাকে। পাহাড়াঞ্চলের কৃষিপদ্ধতি প্রধানত ঝুম শ্রেণীর। কোথাও কোথাও অল্প পরিমাণে সোপান চাষ দেখা যায়। পাহাড় এবং অবতল উভয় অংশে ধানের স্থান প্রথম। রোপিত জমির প্রায় ৮০ শতাংশ ধান উৎপাদন করে। অন্যান্য ফসলের মধ্যে গম, সরিষা, ডাল এবং নানা রকম সবজি উল্লেখযোগ্য। পাহাড়াঞ্চলে কমলালেবু উৎপাদিত হয়।

খনিজ সম্পদ ও শিল্প: মণিপুরে লৌহ, তাম্র, পাথুরে লবণ, চুনাপাথর, নিকেল, লিগনাইট, ট্যালক, ক্রোমাইট ও অ্যাসবেসটসের সন্ধান পাওয়া গেছে। তার মধ্যে পাথুরে লবণ এবং চুনাপাথরের পরিমাণ যথেষ্ট। বর্তমানে অল্প পরিমাণ তাম্র উত্তোলিত হচ্ছে।

এখানকার কুটির শিল্প খুবই উন্নত মানের। ঘরে ঘরে তাঁত প্রায় দুলক্ষ লোকের পূর্ণ বা সাময়িক বৃত্তি হিসেবে গড়ে উঠেছে। পরিধেয় বস্ত্র, লাইসাম্পা বা চটকদার কাঁথা, ব্যাগ, বিছানার চাদর, গামছা ইত্যাদির শিল্পনৈপুণ্য প্রশংসনীয় এবং এর চাহি-দাও ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া তামা-পিতলের বাসন, বেত ও বাঁশের কাজ, পুতুল তৈরির কাজ ইত্যাদি কুটির শিল্পের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়েছে। আধুনিক শিল্প এখনও তেমন প্রসার লাভ করেনি। চালকল, ভোজ্য তেল কল, কাঠচেরাই কল এবং বেকারী, সাবান, হোসিয়ারি দ্রব্য ইত্যাদি শিল্পাকারে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠা লাভ করছে। অধিকাংশ ইম্ফল অবতলে কেন্দ্রীভূত।

যোগাযোগ ব্যবস্থা: জাতীয় সড়ক আসাম ও নাগাল্যাণ্ডের সঙ্গে মণিপুরকে যুক্ত করেছে। পাহাড়াঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই দুর্বল। একমাত্র ইম্ফল শহর বিমানপথে পূর্ব ভারতের কয়েকটি স্থানের সঙ্গে যুক্ত।
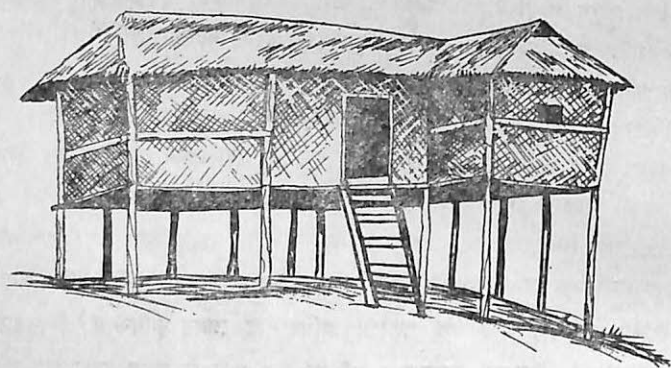
মণিপুরের মাচা কুটির

বসতি, শহর ও নগর: এ রাজ্যের প্রায় ৮৭ শতাংশ অধিবাসী এখনও গ্রামে বাস করে। অধিকাংশ গ্রাম আয়তনে ক্ষুদ্র। ইম্ফল অবতলের গ্রামগুলি স্থানে

স্থানে বৃহদাকৃতি। পাহাড়াঞ্চলে বসতিগুলি পাহাড়ের সমতল শীর্ষদেশে বিচ্ছিন্নভাবে গড়ে উঠেছে। অবতলভূমিতে গ্রামগুলি ঘন সন্নিবদ্ধ প্রকৃতির। গৃহনির্মাণে মাটি, বাঁশ ও ঘাসের ব্যবহার প্রচলিত। বাঁশের খুঁটির ওপর মাচা-গৃহ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

অন্যান্য পূর্ব পার্বত্য রাজ্যের তুলনায় মণিপুরে শহরের সংখ্যা একটু বেশি। এখানে মোট আটটি শহর আছে।

ইম্ফল (জনসংখ্যা: ১০০৩৬৬): পূর্ব পার্বত্য রাজ্যসমূহের মধ্যে ইম্ফল বৃহত্তম শহর ও নগর এবং মণিপুর রাজ্যের রাজধানী। শহরটি পরিকল্পনা অনুযায়ী নতুন-ভাবে তৈরি বলে সুন্দর এবং পরিচ্ছন্ন।

অন্যান্য শহর আকারে ছোট এবং একটি বাদে বাকি ছয়টি শহর একই জেলাতে কেন্দ্রীভূত।

ত্রিপুরা

ভারত স্বাধীন হবার পূর্বে ত্রিপুরা একটি করদ রাজ্য ছিল। স্বাধীনতা লাভের পর এটি কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলে পরিণত হয় এবং ১৯৭২ সালের ২১শে জানুয়ারি পূর্ণাঙ্গ রাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

অবস্থান: সীমান্ত রাজ্য ত্রিপুরার ভৌগোলিক অবস্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। একমাত্র উত্তর-পূর্বদিকে আসাম ও মিজোরাম ভিন্ন অন্য সব দিকে ত্রিপুরা বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের আন্তর্জাতিক সীমানা নির্ধারণ করছে। এই রাজ্যের আয়তন ১০৪৭৭ ব কি এবং লোকসংখ্যা ১,৫৫৬,৩৪২ (১৯৭১)। (মানচিত্র ১২)

ভূপ্রকৃতি ও নদনদী: ত্রিপুরার পূর্বাংশ পার্বত্য। ছয়টি পাহাড়শ্রেণী পরস্পর সমান্তরালভাবে উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রসারিত। পাহাড়গুলির উচ্চতা ক্রমে পূর্বদিকে বেড়ে গেছে। সর্বোচ্চ শৃঙ্গের উচ্চতা ৯৭৫ মি। পাহাড়গুলির মাঝে মাঝে নদী-উপত্যকা অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমির সৃষ্টি করেছে। রাজ্যের পশ্চিমার্ধ নদী-বিধৌত সমভূমি। এটি উত্তরপ্রান্ত থেকে দক্ষিণপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত।

পাহাড়াঞ্চল থেকে উৎপন্ন হয়ে নদীগুলি উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত। নদীর মধ্যে খোয়াই, ধলাই, গোমতী, ফেনী ও মুহারী উল্লেখযোগ্য।

জলবায়ু: এখানকার জলবায়ু মৌসুমী প্রভাবাপন্ন হওয়ায় প্রধানত উষ্ণ ও আর্দ্র। গ্রীষ্মকালের সর্বোচ্চ উত্তাপ ৩৫° সে এবং শীতকালের সর্বনিম্ন তাপ ১১° সে। সাধারণত পাহাড়াঞ্চলে গ্রীষ্মকালের উত্তাপ কম এবং শীতের তীব্রতা বেশি। এখানে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২০০ সেন্টিমিটারের উর্ধ্বে।

স্বাভাবিক উদ্ভিদ: পাহাড়াঞ্চল ঘন অরণ্যে আচ্ছাদিত। এই অরণ্যে শাল, সেগুন, শিশু, ছাতিম, শিমুল প্রভৃতি পর্ণমোচী বৃক্ষ জন্মায়। অরণ্যের অন্যান্য
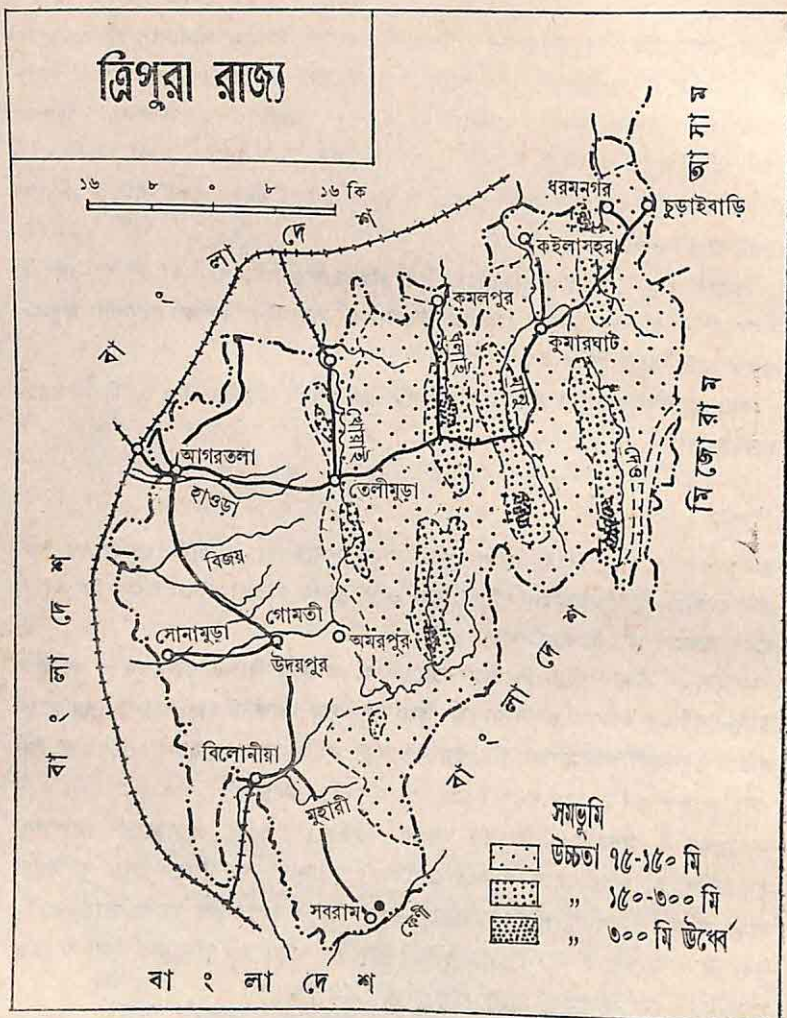
মানচিত্র ১২

সম্পদের মধ্যে বাঁশ ও বেত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সমভূমি অঞ্চলে বাঁশ, বেত, নানা রকম ঘাস ইত্যাদি প্রাধান্য পেয়েছে।

কৃষিকার্য: সমভূমি অঞ্চলের মৃত্তিকা পললজাতীয় ও উর্বর। পাহাড়াঞ্চলে বেলেমাটি ও ল্যাটেরাইট মাটি দেখা যায়।

স্থানীয় অধিবাসীদের ৭৫ শতাংশ কৃষিজীবী। পাহাড়াঞ্চলে ঝুম চাষ প্রচলিত। পাহাড়ের অন্তর্বর্তী নদী উপত্যকা ও সমভূমি অঞ্চলে নিবিড় চাষ হয়ে থাকে। সম-

ভূমিতে জলসেচেরও ব্যবস্থা আছে। উভয় অঞ্চলে ধান প্রধান ফসল। অন্যান্য ফসলের মধ্যে ডাল, ইক্ষু, মেস্তা, চা, তামাক, পান, সুপারী, তুলো, রেশমগুটি এবং সামান্য পরিমাণ কফি উৎপাদিত হয়। এছাড়া ত্রিপুরা নানা রকম ফল উৎপাদনে খ্যাতি লাভ করেছে। ফলের মধ্যে কমলালেবু, কলা, কাঁঠাল, আনারস, কাজুবাদাম ও নারকোল উল্লেখযোগ্য।

খনিজ সম্পদ ও শিল্প: খনিজ সম্পদের দিক থেকে ত্রিপুরা খুব দরিদ্র। নিকৃষ্ট শ্রেণীর লিগনাইট, চুনাপাথর ও রঞ্জনমৃত্তিকা ব্যতীত এখানে অন্য কোন খনিজ পদার্থ নেই।

শিল্পের ক্ষেত্রেও ত্রিপুরা অন্যান্য পার্বত্য রাজ্যের মত অনগ্রসর। চা শিল্প এ রাজ্যের একমাত্র আধুনিক শিল্প। এখানে মোট ৩৭টি কারখানায় চা তৈরি হয়। আগরতলায় কার্পাসকে বীজমুক্ত করার দুটি কারখানা আছে।

কুটির শিল্পের মধ্যে বস্ত্রবয়ন, বেতের কাজ, বাঁশের কাজ, চামড়া ও রেশমের কাজ এবং কাঠখোদাই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

যোগাযোগ ব্যবস্থা: রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে যোগাযোগ রক্ষার প্রধান উপায় সড়ক পথ। প্রধানত সমভূমি অঞ্চলে এবং উত্তরাংশে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নততর। জাতীয় সড়কের দ্বারা আগরতলা আসামের কাছাড় জেলার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে। উত্তরে খোয়াই ও দক্ষিণে বিলোনিয়া রেলপথে বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত।

বসতি, শহর ও নগর: অধিবাসীদের প্রায় ৯০ শতাংশ গ্রামে বাস করে। বাড়ি-গুলো সাধারণত বাঁশ, বেড়া ও শণের ছাউনি দেওয়া।

ত্রিপুরার বাঁশ ও শণের কুটির

আগরতলা (জনসংখ্যা: ৫৯,৬২৫): হাওড়া নদীতীরে অবস্থিত রাজ্যের রাজধানী এবং সর্ববৃহৎ শহর। সমগ্র রাজ্যের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে শহরটি উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। এখানে কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং একটি বিমানবন্দর আছে।

অন্যান্য স্থানের মধ্যে উদয়পুর, বিলোনিয়া, সোনামুড়া ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র।

চতুর্থ অধ্যায়

গাঙ্গেয় সমভূমি

হিমালয়ের দক্ষিণে অবস্থিত গাঙ্গেয় সমভূমি পশ্চিমে যমুনা নদী থেকে আরম্ভ হয়ে পূর্ব দিকে বাংলাদেশের মেঘনা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত। হিমালয়ের উত্থানের পর হিমালয় এবং দক্ষিণ ভারতীয় মালভূমির মধ্যবর্তী অংশ একটা অর্ধ-চন্দ্রাকৃতি অবতলে পরিণত হয়। পর্বতমালা থেকে উদ্ভূত অসংখ্য নদী অজস্র পরিমাণ চূর্ণীকৃত শিলারাশি বয়ে এনে ধীরে ধীরে ঐ অবনমিত অংশে জমা করতে থাকে এবং ক্রমে তা ভরাট করে বর্তমান সিন্ধু-গঙ্গা সমভূমির জন্ম দেয়। গাঙ্গেয় সমভূমি সিন্ধু-গঙ্গা সমভূমির অংশ বিশেষ। এই সমভূমিতে নদীবাহিত সঞ্চিত পদার্থের গভীরতা কোথাও কোথাও ১৯৮০ মি পর্যন্ত পাওয়া গেছে।

নদীপলল দ্বারা গঠিত বিশাল গাঙ্গেয় সমভূমির ভূপ্রকৃতি মোটামুটি বৈশিষ্ট্যবিহীন হলেও এর আঞ্চলিক বিভিন্নতা অস্বীকার করা যায় না। প্রধানত ফসলের প্রকৃতি অনুযায়ী গাঙ্গেয় সমভূমিকে তিনটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়: যেমন (১) উচ্চ গাঙ্গেয় সমভূমি; (২) মধ্য গাঙ্গেয় সমভূমি; এবং (৩) নিম্ন গাঙ্গেয় সমভূমি। উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাংশকে নিয়ে গঠিত উচ্চ গাঙ্গেয় সমভূমিতে রবি অথবা শীতকালীন শুষ্ক ফসলের প্রাধান্য চোখে পড়ে; যথা—গম, যব এবং জোয়ার ও বাজরা এখানে ৬০ শতাংশ কর্ষিত ভূমি অধিকার করে রয়েছে। উত্তর প্রদেশের পূর্ব ভাগ ও বিহার সমভূমিকে নিয়ে গঠিত মধ্য গাঙ্গেয় সমভূমির প্রধান ফসল ধান। এটি খারিফ বা গ্রীষ্মকালীন ফসল। পশ্চিমবঙ্গ নিম্ন গাঙ্গেয় সমভূমির অন্তর্গত। ফসলের মধ্যে ধান এবং পাট ইত্যাদি খারিফ ফসলের প্রাধান্য বৈশিষ্ট্যমূলক। ফসলের বৈশিষ্ট্যের মূল কারণ বৃষ্টিপাতের তারতম্য। সমভূমির পশ্চিম দিক থেকে বৃষ্টি-পাত ধীরে ধীরে বেড়ে গেছে। উচ্চ গাঙ্গেয় সমভূমিতে বৃষ্টিপাত ১০০ সেমির কম। এই কারণে ১০০ সেমি সমবর্ষণ রেখাকে ঐ অঞ্চলের পূর্ব সীমানা হিসেবে ধরা হয়। কোন কোন ভৌগোলিক ১০০ মি সমোন্নতি রেখাকেই (Contour line) উচ্চ গাঙ্গেয় সমভূমির পূর্ব সীমানা হিসেবে নির্দেশ করেছেন। মধ্য গাঙ্গেয় সমভূমি অপেক্ষা নিম্ন গাঙ্গেয় সমভূমিতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অনেক বেশি। এছাড়া ভাষা এবং সংস্কৃতিগত পার্থক্য এই দুই অঞ্চলের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে আঞ্চলিক সীমানা নির্ধারণ করে এসেছে (মানচিত্র ১৩)।

উচ্চ গাঙ্গেয় সমভূমি

অবস্থান: উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাংশ উচ্চ গাঙ্গেয় সমভূমির অন্তর্গত। এর উত্তরে কুমায়ুন অঞ্চল ও নেপাল; পশ্চিমে হরিয়ানা, দিল্লী, এবং রাজস্থান; দক্ষিণে মধ্য প্রদেশ এবং পূর্বে উত্তর প্রদেশের পূর্বাংশ অবস্থিত (মানচিত্র ১৩)।
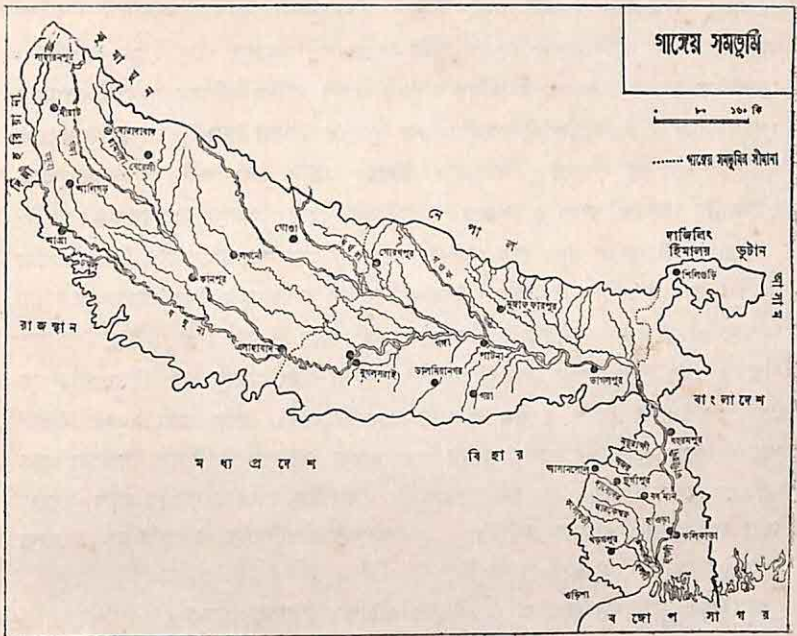
মানচিত্র ১৩

ভূপ্রকৃতি ও নদনদী: এই সমভূমি দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ধীরে ধীরে ঢালু হয়ে গেছে। এই ঢাল অনুযায়ী নদীগুলো দক্ষিণ-পূর্ব বাহিনী। একমাত্র উত্তরের কিছু অংশ ছাড়া সমভূমির সর্বত্র ভূপ্রকৃতি প্রায় একই ধরনের। উত্তরে শিবালিক পর্বতের সম্মুখভাগে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে সমান্তরাল ভাবে প্রলম্বিত ভাবার এবং তরাই বলয়ের ভূপ্রকৃতি ভিন্ন প্রকৃতির। নদীখাত সমতলে পৌঁছে ঢালের অভাবে হঠাৎ প্রশস্ত হয়ে গেছে এবং গতিবেগ হ্রাস পাওয়ার ফলে অজস্র পরিমাণ বড় বড় শিলাখণ্ড, নুড়ি ঐ সব স্থানে জমা হয়ে অন্তর্দেশীয় নদী-বদ্বীপের সৃষ্টি করেছে। শিবালিকের পাদদেশ জুড়ে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে এই ধরনের অন্তর্দেশীয় বদ্বীপ পরস্পর যুক্ত হয়ে প্রায় ৩২ কি প্রশস্ত 'ভাবার' বলয়ের সৃষ্টি করেছে। নদীগুলো এখানে অসংখ্য শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে নিজস্ব সঞ্চিত পদার্থের মধ্য দিয়ে পথ কেটে চলেছে এবং অনেক ক্ষেত্রে কিছু কিছু নদী পাথর, নুড়ি ও বালির মধ্যে হারিয়েও গেছে। ভাবার

এর পরেই 'তরাই' বলয়। ভাবার থেকে নির্গত নদীসমূহ অপেক্ষাকৃত মিহি বালি, কর্দম ইত্যাদি এনে জমা করে তরাই এর সৃষ্টি করেছে। জলাভূমিতে পরিপূর্ণ, গভীর জঙ্গলে আবৃত তরাই কিছুদিন আগেও প্রায় ১০০ কি প্রশস্ত ছিল। বর্তমানে জল-নিষ্কাশন ও কৃষিকার্যের প্রসার ও বননিধনের ফলে স্থানে স্থানে তরাই সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। সমভূমির একটি বৃহৎ অংশ গঙ্গা-যমুনা দোয়াবের অন্তর্গত। দোয়াব অঞ্চলের ভূমি আশেপাশের প্লাবন ভূমি থেকে অপেক্ষাকৃত উঁচু (১৫–৬০ মি)। সমভূমির অনেক স্থান প্লাবনভূমির পর্যায়ে পড়ে। দক্ষিণ-পশ্চিমে চম্বল উপত্যকায় মৃত্তিকা-ক্ষয় ঐ অংশটিকে উদ্ভিদহীন রুদ্র ভূমিতে (bad land) বা স্থানীয় ভাষায় 'বেহড়ে' পরিণত করেছে। নদী-খাত এখানে গভীর এবং অবিরত ক্ষয়ের ফলে দুই নদীর মধ্যবর্তী অংশ খাড়া-ঢাল বিশিষ্ট ছোট ছোট পাহাড়ের মত দেখায়।

প্রধান নদী গঙ্গার সঙ্গে তার মূল উপনদীগুলো প্রায় সমান্তরালভাবে উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত। প্রধান উপনদীর মধ্যে যমুনা উচ্চ গাঙ্গেয় সমভূমির পশ্চিম প্রান্তে এবং রামগঙ্গা এই অঞ্চলের মধ্যভাগে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। গঙ্গা ও তার তিন প্রধান উপনদী যমুনা, রামগঙ্গা এবং ঘর্ঘরা উচ্চ হিমালয় থেকে উৎপন্ন হওয়াতে এদের জলের পরিমাণ অনেক বেশি। গঙ্গা এবং যমুনা বিস্তীর্ণ প্লাবনভূমির সৃষ্টি করেছে। ভূমির ঢাল নগণ্য হওয়ায় নদীগুলো সামান্য বাধা অতিক্রম করতে গিয়ে এঁকে বেঁকে চলেছে। শিবালিক থেকে জন্মলাভ করে অসংখ্য ছোট ছোট নদী উত্তরাংশে প্রবাহিত। একমাত্র চম্বল দক্ষিণের মালভূমি অঞ্চল থেকে উৎপন্ন হয়ে যমুনায় এসে পড়েছে।

জলবায়ু: গ্রীষ্মের প্রখরতা ও শীতের তীব্রতা জলবায়ুর মহাদেশীয় বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তুলেছে। ফেব্রুয়ারি থেকে তাপমাত্রা বাড়তে থাকে এবং মে থেকে জুন মাসের মধ্যে তাপাঙ্ক ৪০° সে গিয়ে দাঁড়ায়। পূর্ব দিক থেকে গাঙ্গেয় সমভূমি দিয়ে আসা সমুদ্রবায়ু এই তাপ কিছুটা কমাতে সাহায্য করে থাকে। কিন্তু 'আঁধি' বা 'লু' নামে পরিচিত পশ্চিমাগত উষ্ণ হাওয়ার প্রভাবে তাপমাত্রা স্থানে স্থানে খুবই বেড়ে যায় এবং অতি উত্তাপ (৪৯° সে) বহু মানুষের মৃত্যু ঘটিয়ে থাকে। উত্তরাংশ অপেক্ষা দক্ষিণাংশে গ্রীষ্ম প্রখরতর। তুলনামূলকভাবে শীতকাল অপেক্ষাকৃত মনোরম। জানুয়ারি মাসে তাপাঙ্ক ২০° সে এর নিচে থাকে। সাধারণত পশ্চিম এবং উত্তর দিকে শীতের মাত্রা অধিকতর।

জুন মাসে দঃ পঃ মৌসুমী বায়ু এসে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে বর্ষাকাল সূচিত হয়। তাপমাত্রাও ধীরে ধীরে কমে আসে। প্রায় ৯০ শতাংশ বৃষ্টি মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ঘটে। জুলাই এবং অগস্ট সর্বাপেক্ষা বৃষ্টিবহুল মাস। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে কমে আসতে থাকে। যেমন পূর্বে এলাহাবাদে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৯০ সে ; দঃ পশ্চিমে আগ্রায় ৬৮ সে, উঃ পূর্বপ্রান্তে গোণ্ডায় ১১৩ সে। শীতকালে পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে অল্প পরিমাণ বৃষ্টি হয়।

স্বাভাবিক উদ্ভিদ : এক কালে সমগ্র সমভূমি অঞ্চল ঘন অরণ্যে পরিপূর্ণ ছিল। দীর্ঘকাল ধরে মনুষ্য-বসতির ফলে অরণ্য উৎসাদিত হতে হতে একমাত্র উত্তরের ভাবার ও তরাই অঞ্চল ভিন্ন বর্তমানে কোথাও অরণ্য নেই। ভাবার ও তরাইয়ের অরণ্য ক্রান্তীয় এবং উপক্রান্তীয় পর্ণমোচী শ্রেণীর। বৃক্ষের মধ্যে শাল, শিমুল, বাবলা এবং খয়ের উল্লেখ্য। এছাড়া এখানে প্রচুর দীর্ঘ ঘাস জন্মায়।

কৃষিকার্য : এখানকার মৃত্তিকা মূলত পলল শ্রেণীর হলেও স্থানবিশেষে গুণগত পার্থক্য দেখা যায়। প্লাবনভূমি বা অপেক্ষাকৃত নিম্নাঞ্চলের মৃত্তিকা সাধারণত বেশি উর্বর। এই মৃত্তিকা 'খাদার' নামে পরিচিত। দোয়াব অঞ্চলের 'ভাঙ্গার' মৃত্তিকা—দোআঁশ জাতীয় এবং উর্বর। সমভূমির পশ্চিমাংশে গঙ্গা-ঘর্ঘরা দোয়াবের কিছু অংশে প্রধানত লবণাক্ত 'রে' মৃত্তিকা দেখা যায়। উত্তর-পশ্চিমে রামগঙ্গা উপত্যকায় বালির ভাগ অধিকতর।
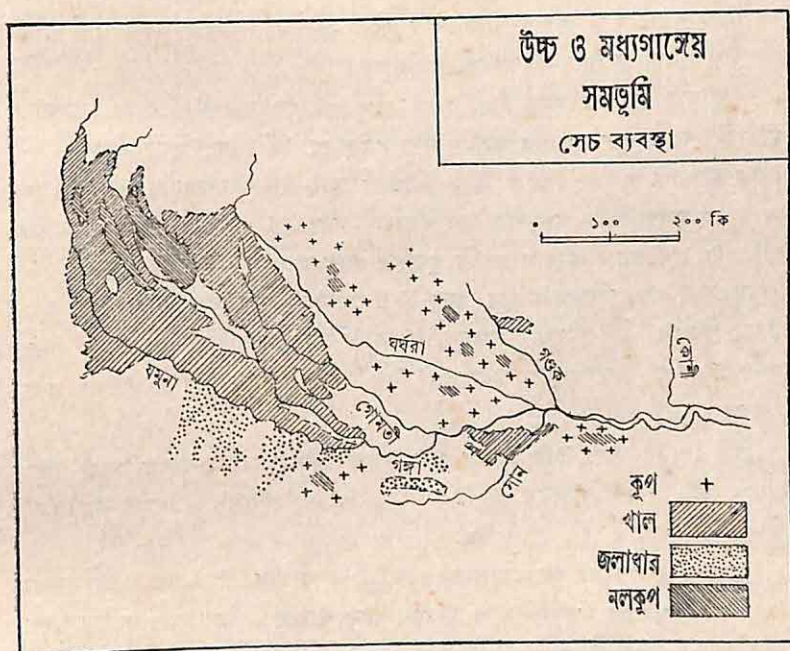
মানচিত্র ১৪

কৃষিকার্যে জলসেচের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উচ্চ গাঙ্গেয় সমভূমির মোট কর্ষিত জমির প্রায় ৩০ শতাংশে জলসেচের স্থায়ী ব্যবস্থা আছে। ইঁদারা, নলকূপ এবং নদী থেকে কাটা-খালের সাহায্যে প্রধানত জলসেচ করা হয়ে থাকে। এ ছাড়া

পুকুর এবং ঝিল জলসেচে কিছুটা সাহায্য করেছে। জলসেচের ক্ষেত্রে ইঁদারা এবং নলকূপের স্থান প্রথম এবং নদীসেচের স্থান দ্বিতীয় (মানচিত্র ১৪)।

উৎপাদিত ফসলের মধ্যে গমের স্থান প্রথম। এই অঞ্চলের প্রায় এক পঞ্চমাংশ কর্ষিত জমি গম উৎপাদনে নিয়োজিত। গঙ্গা-যমুনা-দোয়াব, রামগঙ্গা উপত্যকা ও পশ্চিমাংশে যমুনার দক্ষিণে অবস্থিত সমভূমিতে গমের চাষ সবচেয়ে বেশি। জলসেচের সুযোগ এবং শীতকালীন বৃষ্টি এর মূল কারণ। পূর্ব দিকে গমের চাষ কমে এসেছে এবং তার স্থান নিয়েছে ধান। উত্তরের তরাই অঞ্চল থেকে আরম্ভ করে গোমতী উপত্যকা এবং নিম্নদোয়াব পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ধান প্রধান ফসল। জোয়ার, বাজরা এবং ভুট্টা উৎপাদিত ফসলের মধ্যে তৃতীয় স্থানের অধিকারী। অধিক-তর সহনশীল ফসল হিসাবে জোয়ার এবং বাজরা পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের অপেক্ষাকৃত শুষ্ক এবং লবণাক্ত মৃত্তিকাতে গুরুত্ব লাভ করেছে। তরাই অঞ্চলে ধানের পরেই ভুট্টার স্থান। এছাড়া মধ্য-দোয়াব অঞ্চল এবং উচ্চ গাঙ্গেয় সমভূমির মধ্যভাগ ও দক্ষিণ পশ্চিমাংশে ভুট্টার চাষ হয়। নানা রকম ডাল এবং তৈলবীজ সমভূমির সর্বত্র উৎপাদিত হয়ে থাকে।

বাণিজ্যিক ফসলের মধ্যে ইক্ষ, তুলো এবং পাট উল্লেখযোগ্য। উর্বর দো-আঁশ মৃত্তিকা এবং জল সরবরাহের স্থায়ী ব্যবস্থা সমভূমির উত্তরাংশে ইক্ষুকে প্রধান বাণি-জ্যিক ফসলের মর্যাদা দিয়েছে এবং ভারতের মোট ইক্ষু উৎপাদনের একটি বৃহৎ অংশ এই অঞ্চল থেকে সংগৃহীত হয়ে থাকে। সমভূমির পশ্চিমাংশে তুলো জন্মায়। বৃষ্টিবহুল পূর্ব তরাই এবং সমভূমির পূর্বাংশে স্থানে স্থানে পাট উৎপাদিত হয়।

শিল্প : খনিজ সম্পদের অভাব হেতু উচ্চ গাঙ্গেয় সমভূমিতে ভারী শিল্প গড়ে উঠতে পারেনি। শিল্প এখানে প্রধানত কৃষিনির্ভর এবং মোট পাঁচটি জেলা (কানপুর, লখনৌ, আগ্রা, রামপুর এবং বেরেলী) ভিন্ন অন্যত্র কুটির শিল্পই প্রাধান্য লাভ করেছে।

বৃহৎ শিল্পের মধ্যে চিনি শিল্পের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের মধ্যে উত্তর প্রদেশ চিনি উৎপাদনে প্রথম স্থানের অধিকারী এবং চিনিকলের বৃহত্তম অংশ এই অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত।

বয়নশিল্প এ অঞ্চলের অন্যতম প্রধান বৃহৎশিল্প। কার্পাস, পশম, পাট এবং রেশম শিল্প সম্মিলিতভাবে সর্ববৃহৎ শিল্প হিসাবে গড়ে উঠেছে। তার মধ্যে কার্পাসশিল্পের স্থান প্রথম। একমাত্র কানপুরেই ১৪টি কাপড়ের কল আছে।

বয়নশিল্প ও চিনিশিল্পের পরেই চামড়া শিল্পের নাম করতে হয়। চামড়ার জুতো এবং অন্যান্য জিনিসের জন্য আগ্রা ও কানপুর বিশেষভাবে খ্যাত। আগ্রায় ৩৭টি ও কানপুরে ৯টি জুতোর কারখানা আছে। এছাড়া সাহারানপুর এবং লখ্নৌ কাগজ শিল্পের প্রধান কেন্দ্র। অন্যান্য শিল্পের মধ্যে কাঠ-চেরাই, প্লাইউড, লৌহ ও ইস্পাত

দ্রব্য, বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম, রাসায়নিক শিল্প, কৃত্রিম সার ও রবারজাত দ্রব্যাদি শিল্প এ অঞ্চলে নানা স্থানে গড়ে উঠেছে।

ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্প হিসেবে চাল, ডাল, তেল, রুটি ও বিস্কিট ইত্যাদির কাজ কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কুটির শিল্পের ক্ষেত্রেও এ অঞ্চলটি প্রাচীন কাল থেকে খ্যাতি লাভ করে এসেছে। তামা-পিতলের বাসনের জন্য মোরাদাবাদ, আগ্রা, লখনৌ ও হাথরাস প্রসিদ্ধ, ছুরি-কাঁচি ও তালা শিল্পের জন্য আলিগড়ের খ্যাতি আছে।

যোগাযোগ ব্যবস্থা: তরাই এবং দক্ষিণের কিছু স্থান ব্যতীত যোগাযোগ ব্যবস্থা যথেষ্ট উন্নত। রেলপথের দ্বারা এ অঞ্চলের পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে এবং উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে অবস্থিত বিভিন্ন স্থানের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। লখনৌকে কেন্দ্র করে গোমতী উপত্যকার মধ্যভাগ এবং আলিগড়-আগ্রা ও কানপুর-লখনৌর মধ্যে রেলপথের ঘনত্ব সর্বাপেক্ষা অধিক। রেলপথের ন্যায় সড়কপথের ঘনত্বও ঐসব অঞ্চলে বেশি। দৈর্ঘ্য অনেক বেশি হওয়া সত্ত্বেও অনেক স্থানে, বিশেষ করে তরাই এবং সমভূমির উত্তর-পূর্বাংশে পাকা সড়কের অভাব রয়েছে। অধিকাংশ নদী নাব্য এবং নদীপথে নানা স্থানের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। কয়েকটি প্রধান নগর; যথা—কানপুর, লখ্নৌ, আগ্রা এবং এলাহাবাদ বিমানপথের কেন্দ্র।

বসতি, শহর ও নগর: উচ্চ গাঙ্গেয় সমভূমির অধিকাংশ লোক (প্রায় ৮২ শতাংশ) গ্রামবাসী। এখানকার গ্রামের আয়তন নানা রকমের হয়ে থাকে। প্রধানত উচ্চ দোয়াব অঞ্চল ও যমুনা নদীর দক্ষিণে বৃহদায়তন গ্রাম (জনসংখ্যা ২০০০-৫০০০) সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। তরাই এবং রামগঙ্গা উপত্যকায় ছোট গ্রামের (জনসংখ্যা ৫০০ এর নিম্নে) সংখ্যা বেশি।

কৃষিসমৃদ্ধ স্থানে গ্রামগুলি সন্নিবদ্ধ প্রকৃতির এবং আয়তনেও বৃহৎ বা মাঝারি। নদী বা সড়কপথের ধারে রেখাকৃতি (linear) বসতি দেখা যায়। তরাই অঞ্চলে বসতি বিক্ষিপ্ত প্রকৃতির। সমভূমি অঞ্চলের গ্রামীণ গৃহ প্রধানত টালির ছাদ এবং কাদা বা আধ-পোড়া ইট দিয়ে তৈরি হয়। তরাই অঞ্চলে গৃহের দেওয়াল নলশরের ওপর মাটি ও গোবরের পলেস্তরা দিয়ে তৈরি হয় এবং চালের জন্য ঘাস ব্যবহৃত হয়।

এই অঞ্চলের দক্ষিণাংশে শহর ও নগরগুলো প্রধানত কেন্দ্রীভূত। শহরের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম।

আগ্রা (জনসংখ্যা ৫৯১,৯১৭): ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে লোদী-সুলতানদের রাজধানী রূপে আগ্রা প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। পরবর্তী কালে মুঘল রাজত্বে আগ্রার প্রভূত শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। মুঘল সম্রাট শাহজাহানের তৈরি তাজমহল এবং ঐ আমলের অন্যান্য ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধ আজও পর্যটকদের প্রধান আকর্ষণ। উচ্চ গাঙ্গেয় সমভূমির পশ্চিমে যমুনাতীরে অবস্থিত আগ্রা রেলপথ ও সড়কপথের সংযোগস্থল হিসেবে শিল্প ও বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছে।

লখ্‌নৌ (জনসংখ্যা : ৭৪৯,২৩৯) : নবাব আমলের অনেক উদ্যান ও সবুজ ময়দানের জন্য লখ্‌নৌকে 'উদ্যান নগরী' বলা হয়। উত্তর প্রদেশের বর্তমান রাজধানী হিসাবে এই নগর প্রধান প্রশাসনিক কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। রেল ও সড়কপথে যোগাযোগের সুব্যবস্থা এখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে সহায়তা করেছে।

কানপুর (জনসংখ্যা : ১,১৫৮,৩২১) : বিভিন্ন ধরনের শিল্প-সমাবেশ গঙ্গাতীরে অবস্থিত কানপুরকে এই অঞ্চলের বৃহত্তম নগর হিসেবে গড়ে তুলেছে। ইংরেজ আমল থেকে এখানে একটি বড় সৈন্যছাউনি আছে। এখানকার কারিগরি শিক্ষার বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষভাবে খ্যাত।

এলাহাবাদ (জনসংখ্যা : ৪৯২,৪৪৫) : গঙ্গা-যমুনা এবং অধুনালুপ্ত সরস্বতী নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত প্রয়াগ বা এলাহাবাদ প্রাচীন কাল থেকে হিন্দুদের পরম পবিত্র তীর্থস্থান। বর্তমানে প্রশাসনিক কার্যকলাপ ছাড়া উচ্চশিক্ষা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্র হিসাবে এলাহাবাদ গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী।

বেরেলী, মীরাট ও আলিগড় অন্যান্য উল্লেখযোগ্য শহর। আলিগড় একটি শিল্প ও শিক্ষাকেন্দ্র (মানচিত্র ১৩)।

মধ্য গাঙ্গেয় সমভূমি

অবস্থান : গঙ্গার উত্তর এবং দক্ষিণ প্রান্তে বিস্তৃত উত্তর প্রদেশের পূর্বার্ধ ও বিহারের উত্তরার্ধ নিয়ে গঠিত মধ্য গাঙ্গেয় সমভূমি নানা দিক থেকে উচ্চ এবং নিম্ন গাঙ্গেয় সমভূমির মধ্যে ক্রমপরিবর্তনমণ্ডিত (transitional) অঞ্চল হিসাবে চিহ্নিত। উত্তরে হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল (নেপাল) ও দক্ষিণে মধ্যভারত ও বিহারের মালভূমির মাঝখানে এটি অবস্থিত (মানচিত্র ১৩)।

ভূপ্রকৃতি ও নদনদী : উচ্চ গাঙ্গেয় সমভূমির মত মধ্য গাঙ্গেয় সমভূমি উত্তরাংশে প্রায় বৈশিষ্ট্যহীন হলেও স্থানে স্থানে ভূ-প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য চোখে পড়ে। এই অঞ্চলের গড় উচ্চতা সাধারণত ১৫০ মিটারের নিচে এবং পূর্ব দিকে ধীরে ধীরে ঢালু হয়ে তা ৩০ মিটারে নেমে এসেছে। সমভূমির উত্তর-প্রান্তে তরাই ও অপেক্ষাকৃত নিম্ন জলাভূমি স্থানে স্থানে ভাঙাজমি সমন্বিত। তরাইএর অজস্র অশ্বখুরাকৃতি হ্রদ, মৃত অথবা পরিত্যক্ত নদীখাত এবং 'তাল' বা বৃহদাকৃতি ঝিল ভূপ্রকৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। পূর্বদিকে বিহারের অন্তর্গত সমভূমির উত্তরাংশ কোশী ইত্যাদি অসংখ্য নদীসৃষ্ট অন্তর্দেশীয় বদ্বীপের সমন্বয়ে গঠিত। এই অঞ্চলে অনেক অশ্বখুরাকৃতি হ্রদ, ঝিল ইত্যাদি বর্তমান। এখানকার প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য নদীপ্রকৃতির উপর নির্ভর-শীল। অতএব এ অঞ্চলকে নানা নদী-বিভাজিকায় ভাগ করা চলে।

মধ্য গাঙ্গেয় সমভূমির নদীপ্রবাহের প্রকৃতি উপনদী-বহুল। গঙ্গা নিঃসন্দেহে এ অঞ্চলের প্রধান নদী। এর উত্তর ভাগে দক্ষিণ-বাহিনী প্রধান প্রধান উপনদী পশ্চিম

থেকে পূর্বে ঘর্ঘরা, গণ্ডক ও কোশী। দক্ষিণে উত্তর-বাহিনী অনেক উপনদীর মধ্যে শোন উল্লেখযোগ্য। বর্ষাকালে এইসব নদীর বিপুল জলধারা প্রচুর পলি বহন করে আনে ও ফলে এই সকল নদীর সন্নিহিত অঞ্চলে প্রবল বন্যার আশঙ্কা থাকে। গঙ্গার প্রধান উপনদীগুলি তাদের নিজস্ব বহু উপনদীর জলপুষ্ট। এই বিরাট সংখ্যক নদীর জলপ্রবাহ ও প্লাবনের ফলে এ অঞ্চলের নদীর গতিপথের বহু পরিবর্তন হয়েছে। গঙ্গা নিজে তার প্লাবনভূমিতে দক্ষিণ থেকে উত্তরে সরে গেছে, ও কোশী নদী পূর্ব থেকে বহু পশ্চিমে সরে গেছে। এক সময় কোশী নদী পূর্বে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিলিত ছিল। বর্তমানে তা প্রায় গঙ্গা-গণ্ডক মিলনস্থলে গিয়ে পড়েছে (মানচিত্র ১৩)।

জলবায়ু: মধ্য গাঙ্গেয় সমভূমির কিছুটা মহাদেশীয় অবস্থান হলেও মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে এখানকার জলবায়ু উচ্চ গাঙ্গেয় সমভূমি অপেক্ষা মৃদুভাবাপন্ন। শীতের তীব্রতা এখানে নিম্ন গাঙ্গেয় সমভূমি অপেক্ষা বেশি এবং পশ্চিমাবায়ুর সাময়িক প্রবাহ ও বৃষ্টিপাতের ফলে শৈত্যের মাত্রা যথেষ্ট বেড়ে যায়। এ সময় তাপমাত্রা গড়ে ১৬° সে এর মত। কিন্তু পূর্বে এই তাপমাত্রা প্রায় ১৯° সে পর্যন্ত হতে দেখা যায়।

মার্চ মাস থেকে উত্তাপ বাড়তে থাকে এবং মে মাসে পূর্বে সর্বোচ্চ উত্তাপ ৩২° সে এর ওপর পর্যন্ত হয়। সাধারণত এই উষ্ণকাল শুষ্ক। তবে উষ্ণ ঝড়ের ফলে এ সময় সামান্য বৃষ্টিপাত (৪ সে) হয়।

জুন মাসের প্রায় মাঝামাঝি থেকে মৌসুমী বায়ু প্রবাহের ফলে বর্ষাকাল শুরু হয় ও তা সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত স্থায়ী হয়। যথেষ্ট বৃষ্টিপাতের ফলে এ সময় তাপমাত্রা অনেকটা কমে যায় ও বায়ুর আর্দ্রতা বাড়ে। পশ্চিমে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ৫০ সে থেকে পূর্বে ১৫০ সে ও উত্তরে ১৬০ সে এর অধিক।

সেপ্টেম্বরের শেষ থেকে অক্টোবর পর্যন্ত অপসৃয়মান মৌসুমী ঋতুতে বায়ুর আর্দ্রতা অত্যন্ত বেশি থাকে ও আকাশ পরিষ্কার থাকে। এ সময় থেকে উত্তাপ ক্রমশ কমতে শুরু করে ও নভেম্বর মাস থেকে শীতকাল শুরু হয়।

স্বাভাবিক উদ্ভিদ: বর্তমান মধ্য গাঙ্গেয় সমভূমি সাভানা উদ্ভিদ অঞ্চলের অন্তর্গত। নিবিড় চাষ ও ঘনবসতির ফলে মৌলিক বনভূমি এখানে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। যে সামান্য অংশে প্রাক্তন বনভূমি বর্তমান তা পর্ণমোচী বা শাল, শিশু, জাম ও মহুয়া জাতির বৃক্ষসমন্বিত। অন্যত্র সাভানা জাতীয় ঘাস ও বিভিন্ন বৃক্ষে আচ্ছাদিত। এইসব বৃক্ষ বেশির ভাগ মনুষ্য-নির্বাচিত প্রয়োজনীয় গাছসমূহ। যেমন অশ্বত্থ, বট, মহুয়া, নিম, বাব্‌লা, তাল, খেজুর ইত্যাদি।

কৃষিকার্য: এই অঞ্চলের কৃষিভূমি স্থানবিশেষে ৬৫ শতাংশ থেকে ৯৫ শতাংশ পর্যন্ত হতে দেখা যায়। পতিত জমির পরিমাণ এখানে কম। এ অঞ্চলে অধিকাংশ চাষ স্বয়ংভোগী পর্যায়ের ও বাণিজ্যিক ফসলের প্রাধান্য অপেক্ষাকৃত কম।

ধান এ অঞ্চলের সর্বপ্রধান ফসল। এরপর যথাক্রমে ছোলা, গম, বালি, ভুট্টা,

ডাল, সবজি ইত্যাদির স্থান। বাণিজ্যিক ফসল হিসাবে ইক্ষু ও তৈলবীজের ফলন যথেষ্ট নয়।

কৃষিকার্যের প্রয়োজনে এ অঞ্চলে সেচব্যবস্থা যথেষ্ট উন্নত। পশ্চিমভাগে খাল-সেচের প্রাধান্য লক্ষণীয় (মানচিত্র ১৪)। দক্ষিণ বিহারের খালসেচ যথেষ্ট উন্নত। উত্তর বিহারে একমাত্র চম্পারণ জেলায় কিছু খালসেচের ব্যবস্থা আছে। চম্পারণের দক্ষিণে ইঁদারা ও নলকূপ থেকে জলসেচ হয়। উত্তর প্রদেশের পূর্বে ও বিহার সমভূমিতে ইঁদারা ও নলকূপ জলসেচের প্রধান উপকরণ। এখানকার ভূপ্রকৃতি ইঁদারা নির্মাণের অনুকূল হওয়ায় এর প্রাচুর্য লক্ষণীয়। গভীর নলকূপগুলি বিদ্যুৎশক্তি দ্বারা চালিত হয়। জলসেচের মাধ্যম হিসাবে নলকূপ শ্রেষ্ঠ স্থানের অধিকারী এবং এগুলি জলাশয়, ঝিল বা কূপ সেচের অন্তরায় নয়।

শিল্প: এ অঞ্চলে খনিজ সম্পদ ছাড়াই নানা শিল্প গড়ে উঠেছে এবং এখানকার প্রধান শিল্পগুলি কৃষিনির্ভর, যেমন কার্পাস, বয়ন শিল্প ও চিনি শিল্প। অন্যান্য শিল্পের মধ্যে বারাউনির পেট্রোলিয়াম শিল্প, ডালমিয়া নগরের সিমেন্ট, কাগজ, রাসায়-নিক ও বনস্পতি তেল শিল্প, গোরখপুর ও জামালপুরের রেল কারখানা, গোরখপুরের সার কারখানা, মারুয়াডির ডিজেল কারখানা ও শাহপুরের রাসায়নিক শিল্প উল্লেখযোগ্য। এছাড়া অন্যান্য কৃষিনির্ভর শিল্প—চাল, ময়দা, ডাল ও তেল পেষাই, ফল ও মৎস্য সংরক্ষণ ইত্যাদি।
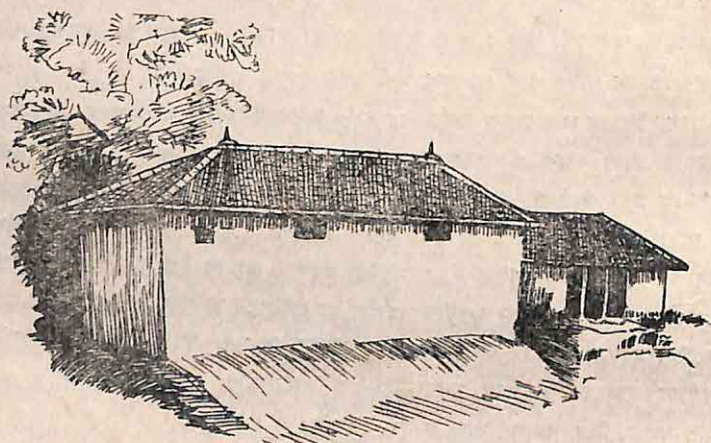
উত্তাপের জন্য বাড়ির বিশেষ গড়ন

যোগাযোগ ব্যবস্থা: মধ্য গাঙ্গেয় সমভূমিতে রেলপথ অপেক্ষা সড়কপথের জাল অধিক গুরুত্বপূর্ণ। নানা শ্রেণীর সড়কপথের মধ্যে জাতীয় সড়ক উল্লেখ্য। যে

তিনটি প্রধান রেলপথ এ অঞ্চলে প্রসারিত তাদের নাম পূর্ব রেল, উত্তর রেল ও উত্তর-পর্ব রেল। এক সময় জলপথ গঙ্গানদী বক্ষে বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বর্তমানে নাব্য অঞ্চলে নদী পারাপারের প্রয়োজনে জলপথ ব্যবহৃত হয়।

বারাণসী ও পাটনা এই অঞ্চলের দুটি বিমানকেন্দ্র। নেপালের কাঠমুণ্ডর সাথে এদের যোগাযোগ বর্তমান---কিন্তু দক্ষিণে বিমানপথে সরাসরি কোন যোগাযোগ নেই।

বসতি, শহর ও নগর : এই সমভূমি ঘনবসতি অঞ্চল ও এখানকার ৯৩ শতাংশ অধিবাসী গ্রামবাসী। অধিকাংশ গ্রাম মধ্যমাকৃতির ও সেখানকার জনসংখ্যা ৫০০ থেকে দু হাজারের মধ্যে। পূর্ব ও পশ্চিম ভাগ অপেক্ষা মধ্যভাগে লোকবসতি ঘন। গ্রামাঞ্চলের বসতিগৃহগুলি অধিকাংশ কুটির শ্রেণীর ও তা মৃত্তিকা, শণ, টালি ও টিন দ্বারা গঠিত। উত্তাপের জন্য এইসব কুটিরের জানালা-দরজার সংখ্যা কম ও জানালাগুলি দেওয়ালের উপরিভাগে নির্মিত।
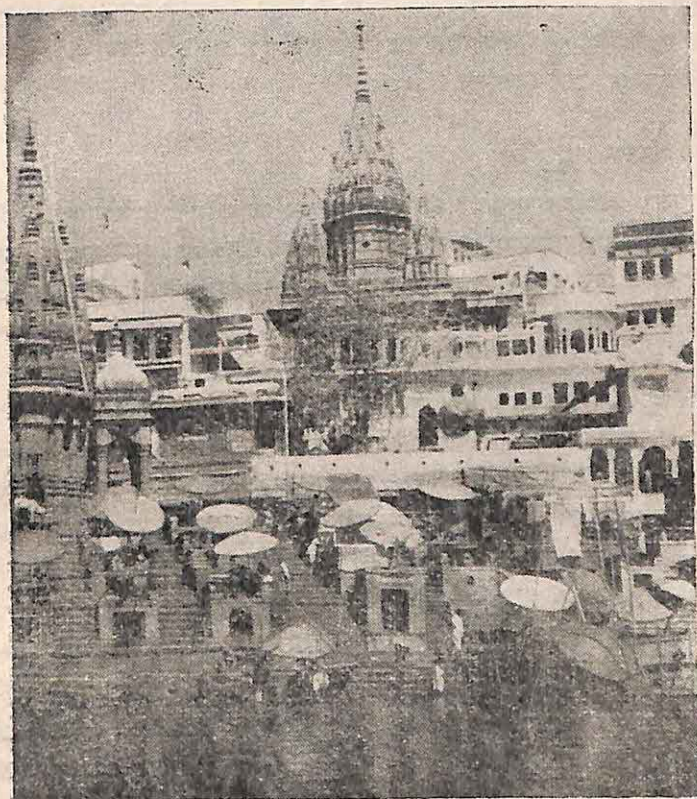
বারাণসীর নদীঘাট

এ অঞ্চলের শহর ও নগরের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। এইসব শহর ও নগরের মধ্যে বারাণসী, পাটনা, অযোধ্যা, বালিয়া, গাধীপুর, বিন্ধ্যাচল, চুনার, গয়া ও চম্পা অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ।

বারাণসী (জনসংখ্যা : ৫৮৮,৬০৮) : হিন্দু ভারতের ঐতিহ্যমণ্ডিত প্রাচীন সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। গঙ্গানদীর তীরে এই তীর্থনগরীর শোভা অপূর্ব। এখানকার বেনারসী রেশম বস্ত্র ও নানা কারুশিল্প প্রসিদ্ধ। এই নগরীর অদূরে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় একটি খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষাকেন্দ্র।

পাটনা (জনসংখ্যা : ৪৭৫,৩০০) : প্রাচীন পাটলীপুত্র নগরীর প্রতিভূ। বর্তমানে এই নগর বিহার রাজ্যের রাজধানী ও বিশিষ্ট প্রশাসনিক ও শিক্ষাকেন্দ্র।

গোরখপুর (জনসংখ্যা : ২৩০,৯১১) : রাপ্তী নদীতীরে গোরখনাথ মন্দিরের পটভূমিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ রেল ও শিক্ষাকেন্দ্র।

অন্যান্য শহরের মধ্যে অযোধ্যা, বালিয়া, গাধীপুর, বিন্ধ্যাচল, চুনার, কুশভবনপুর, গয়া, চম্পা ইত্যাদি ঐতিহাসিক কেন্দ্র; মুজফফরপুর, মোতিহারি ইত্যাদি প্রশাসনিক কেন্দ্র ও মোগলসরাই রেলকেন্দ্র (মানচিত্র ১৩)।

নিম্ন গাঙ্গেয় সমভূমি

অবস্থান : গাঙ্গেয় সমভূমির পূর্বতম অংশে নিম্ন গাঙ্গেয় সমভূমি অবস্থিত। প্রাচীন বঙ্গ বা প্রাচ্য অঞ্চল বলতে এই অঞ্চলকেও বোঝাত। পুরুলিয়া বাদে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও বিহারের পূর্ণিয়া জেলার কিষাণগঞ্জ থানা বা তহশীল এর অন্তর্গত। এর উত্তরে নেপাল-দার্জিলিং-এর পার্বত্য ভূভাগ, ভুটান; পূর্বে আসাম ও বাংলাদেশ; দক্ষিণে ওড়িশা; ও পশ্চিমে দক্ষিণ-বিহার ও মধ্য গাঙ্গেয় সমভূমি (মানচিত্র ১৩)।

ভূপ্রকৃতি ও নদনদী : পূর্বোল্লিখিত অঞ্চল নিম্ন গাঙ্গেয় সমভূমিরূপে অভিহিত হলেও প্রকৃতপক্ষে বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার পশ্চিম প্রান্ত দক্ষিণের মালভূমির অংশবিশেষ বলা সমীচীন। এই সমভূমি উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্বে ক্রমশ ঢালু। সমগ্র নিম্ন গাঙ্গেয় সমভূমিকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—(১) উত্তরবঙ্গের সমভূমি অঞ্চল ও বারেন্দ্রভূমি; (২) দক্ষিণ-পশ্চিম উচ্চভূমি অঞ্চল; (৩) ভাগীরথী-হুগলী সমভূমি; এবং (৪) নিম্ন বদ্বীপ অঞ্চল ও সুন্দরবন।

তরাই ও ডুয়ার্সের দক্ষিণ থেকে মালদহ জেলা পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের সমভূমি অঞ্চল ও বারেন্দ্রভূমি অবস্থিত। গঙ্গা ও তার উপনদী-বাহিত পলল দ্বারা এই সমভূমি গঠিত। পশ্চিম দিনাজপুর ও মালদহ জেলার পূর্বাংশ সম্পূর্ণ সমতল নয়। এই অংশ কিছুটা আন্দোলিত ও ৩০ মি উচ্চতাবিশিষ্ট ঢিবি সমন্বিত। এই অঞ্চলটিই বারেন্দ্রভূমি নামে পরিচিত। বারেন্দ্রভূমি-সন্নিহিত সমভূমি অপেক্ষাকৃত পুরাতন পলল দ্বারা গঠিত।
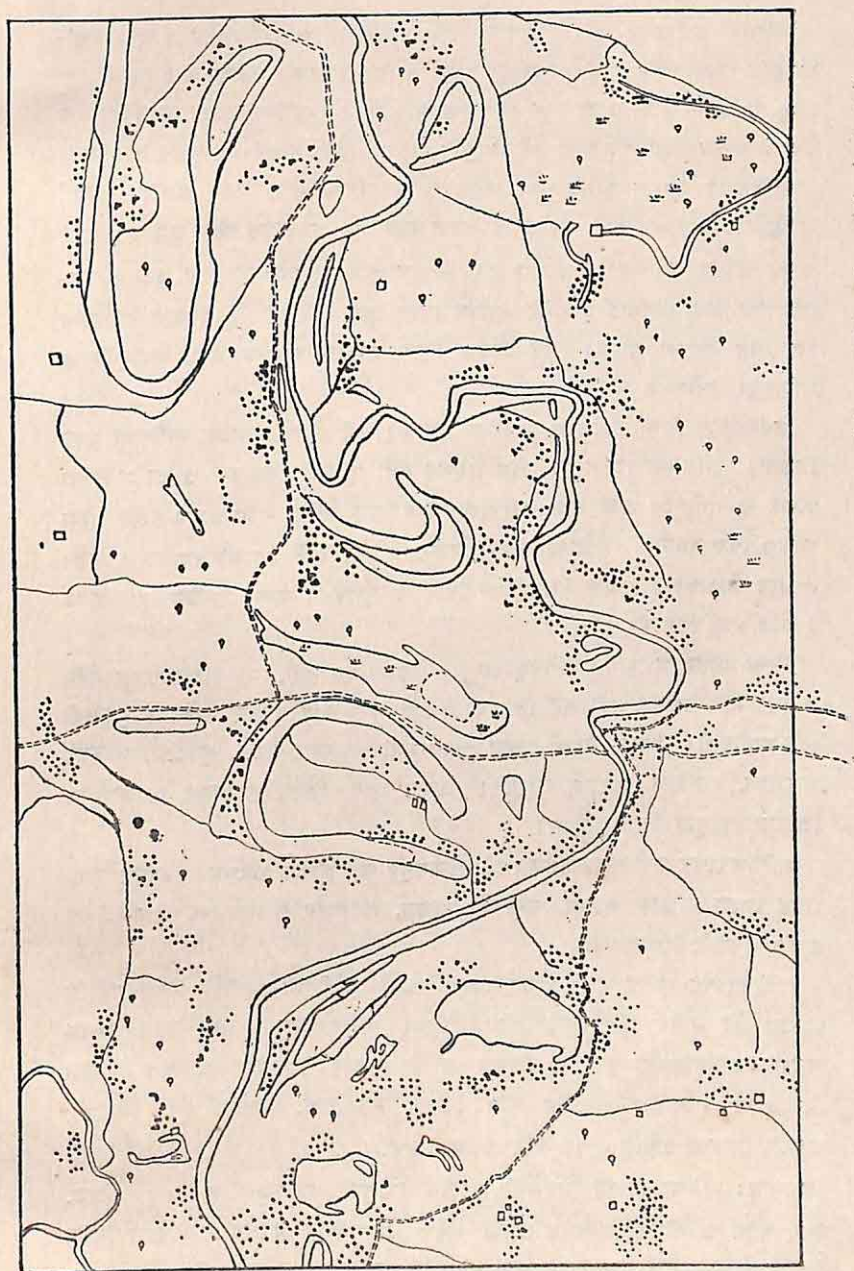
অশ্বখুরাকৃতি হ্রদ, বিল ও ব্যাপক বসতি

পশ্চিম মালভূমির পূর্বে বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলায় উচ্চ-সমভূমি অঞ্চল বিস্তৃত। এই ভূভাগ বন্ধুর ও কিছুটা রুক্ষ। এখানকার গড় উচ্চতা ১০০ মিটারের উর্ধ্বে ও তা বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডে পূর্ণ। ছোটনাগপুরের মালভূমি থেকে উৎপন্ন নদীসমূহের পলি দ্বারা এই সমভূমি গঠিত। দক্ষিণপূর্বে এই অঞ্চল ক্রমনিম্ন।

পশ্চিমের উচ্চ-সমভূমির পূর্বে বাংলাদেশের পশ্চিম সীমা পর্যন্ত ভাগীরথী-হুগলী সমভূমি। গঙ্গা ও তার শাখানদীর পলল দ্বারা এই সমভূমির গঠন হয়েছে। এই অঞ্চল গাঙ্গেয় বদ্বীপের অন্তর্গত ও তা নিম্নসমভূমি অঞ্চল। নিম্ন ভূভাগে অবক্ষেপণের ফলে নদীখাত সন্নিহিত এলাকা থেকে বেশ খানিকটা উঁচু হওয়ায় বর্ষাকালে প্লাবনের আশঙ্কা থাকে। এই অঞ্চল নিম্ন সমতল হওয়ায় বিল, জলাভূমি ও পরিত্যক্ত নদীখাতে পূর্ণ।

সর্বদক্ষিণে নিম্ন বদ্বীপ ও সুন্দরবন অঞ্চল। এই অঞ্চল অসংখ্য নদীশাখা দ্বারা বিভক্ত। প্রতিদিন জোয়ারের ফলে এইসব নদী পলি-প্লাবিত হয় ও তা সন্নিহিত অঞ্চল ও নদীমুখে জমা হয়ে বদ্বীপকে দক্ষিণ দিকে বর্ধিত করে চলে। এই গঠন আজও শেষ হয়নি। অপর দিকে সমুদ্রসৈকত অবিরত ঢেউ-এর আঘাতে ভেঙে যায়। এভাবে ভাঙাগড়ার ভেতর দিয়ে নিম্ন বদ্বীপ ও সুন্দরবন অঞ্চল গঠিত হয়েছে ও এখনও হয়ে চলেছে।

নিম্ন গাঙ্গেয় সমভূমির নদীসমূহকে (১) উত্তরাংশের নদী, (২) পশ্চিমাংশের নদী, ও (৩) দক্ষিণাংশের নদী, এই তিন ভাগে ভাগ করা যায়। এই অঞ্চলের মূল নদী গঙ্গা-ভাগীরথী। গঙ্গার উত্তরে প্রধান প্রধান নদী মহানন্দা, তিস্তা, পুনর্ভবা, আত্রেয়ী, জলঢাকা, রায়ডাক, তোরসা ইত্যাদি। এদের মধ্যে তিস্তা, জলঢাকা, রায়ডাক ও তোরসা ব্রহ্মপুত্রে গিয়ে পড়েছে।

পশ্চিমাংশের নদীগুলি অধিকাংশ ছোটনাগপুর মালভূমিতে উৎপন্ন। এদের মধ্যে উত্তর থেকে দক্ষিণে দ্বারকা, ময়ূরাক্ষী, অজয়, দামোদর, রূপনারায়ণ, কংসাবতী ও হলদি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

দক্ষিণাংশের নদীর মধ্যে গঙ্গার প্রধান শাখা ভাগীরথী-হুগলী। নিম্ন-সমভূমি অঞ্চলে এই নদীর আঁকাবাঁকা গতি লক্ষণীয়। আঁকা-বাঁকা প্রবাহের ফলে এখানে অসংখ্য অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ ও বিলের সৃষ্টি হয়েছে। হুগলী মোহনার বিরাটত্ব বিস্ময়কর। ভাগীরথী-হুগলীর পূর্বে ভৈরব, মাথাভাঙ্গা, জলঙ্গী, চূর্ণী, ইছামতী, মাতলা, গোসাবা প্রভৃতি নদীর শ্লথ প্রবাহ উল্লেখযোগ্য।

জলবায়ু : নিম্ন গাঙ্গেয় সমভূমি ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ুর অন্তর্গত। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ ও শীত এখানকার চারটি ঋতু। ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি থেকে শীতের অবসান হয়ে উষ্ণতা বাড়তে থাকে ও গ্রীষ্মকালের সূচনা হয়। মে মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এ সময় তাপমাত্রা ২৩° সে থেকে ৩৩° সে পর্যন্ত হতে পারে।

উষ্ণতা ও আর্দ্রতার ফলে গ্রীষ্মকালে 'কালবৈশাখী' ঝড়ের প্রকোপ দেখা যায়। এছাড়া অপরাহ্ণ ও সন্ধ্যায় ঝঞ্ঝাবৃষ্টি (Thunderstorms) এই সময়ের একটি স্বাভাবিক ঘটনা।

জুন মাস থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বর্ষাকাল শুরু হয় ও তা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্থায়ী হয়। বর্ষাকালে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সর্বত্র সমান নয়। এর পরিমাণ দক্ষিণ-পশ্চিমে ১৫০ সে বা তার কম এবং উত্তরে ৩০০ সে এর উর্ধ্বে।

অক্টোবর-নভেম্বর শরৎকাল বা অপসৃয়মান মৌসুমী ঋতু। এ সময় আকাশ নির্মেঘ ও বায়ু জলকণাসম্পৃক্ত থাকে। সম্পৃক্ত বায়ুর ফলে এ সময়ের গুমোট ভাব বেশ অস্বস্তিকর হয়। নদীনালা ও জলাশয় জলপূর্ণ থাকায় বাতাসে জলকণার ভাগ অত্যন্ত বেশি হতে দেখা যায় ও এর ফলে মাঝে মাঝে ঝড় হয়। একে স্থানীয় ভাষায় 'আশ্বিনে ঝড়' বলে।

নভেম্বরের শেষ থেকে সূর্যতাপ কমতে থাকে ও শীতকাল প্রতিষ্ঠিত হয়। ডিসেম্বর জানুয়ারিতে তাপমাত্রা সর্বাপেক্ষা কম ও এ সময়ে আবহাওয়া প্রায় শুষ্ক থাকে। পশ্চিমা দুর্যোগের জন্য সময় সময় সামান্য পরিমাণে বৃষ্টি হয় ও শৈত্যের মাত্রা বেড়ে যায়। শীতকালে তাপমাত্রা ১৭° সে থেকে ২৪° সে পর্যন্ত হতে দেখা যায়।

স্বাভাবিক উদ্ভিদ: নিবিড় চাষের ফলে নিম্ন গাঙ্গেয় সমভূমি প্রায় অরণ্যহীন। দক্ষিণে নিম্ন বদ্বীপ অঞ্চলে নিয়ত প্লাবন বনভূমি ও পশ্চিমে বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলায় পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য দেখা যায়। প্লাবন বনভূমি চিরহরিৎ বৃক্ষের অরণ্য। এই অরণ্যের বৃক্ষসমূহ পত্রবহুল, দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ। এসব বৃক্ষের মধ্যে সুন্দরী, গরাণ, গেঁওয়া, গর্জন, নীপা পাম ইত্যাদি উল্লেখ্য।

পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য বৃক্ষবিরল অরণ্য। এখানকার প্রধান বৃক্ষ শাল। অন্যান্য বৃক্ষের মধ্যে পলাশ, মহুয়া, খয়ের ও রোজউড উল্লেখযোগ্য।

এই সমভূমির অরণ্য বহির্ভূত অঞ্চলে শাল, কাঁঠাল, আম, অশ্বত্থ, বট, নিম, তেঁতুল, ছাতিম, বেল, বাবলা, নারকোল, সুপারী, তাল, খেজুর গাছ দেখতে পাওয়া যায়।

কৃষিকার্য: পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম প্রধান উপজীবিকা কৃষিকার্য। সমগ্র ভূভাগের প্রায় ৬০ শতাংশ কৃষিভূমি। উর্বর পলিমাটি, পর্যাপ্ত উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত সার্থক কৃষিকার্যের সহায়।

উৎপন্ন ফসলের মধ্যে সর্বপ্রধান ধান। ঋতুগত উৎপাদন অনুযায়ী তিন প্রকার ধানের নাম করা যায়। যেমন আমন ধান, আউস ধান, ও বোরো ধান। এদের মধ্যে আমন ধানই প্রধান। ধান মুখ্যত নিম্নভূমির ফসল।

ধানের পর পাট, ডাল, গম, বালি, ভুট্টা, জোয়ার, তৈলবীজ, ইক্ষু, আলু, তামাক ও নানাবিধ সবজির স্থান। অন্যান্য ফসলের মধ্যে চা, পান, নানাবিধ ফল, সিঙ্কোনা তুঁত ইত্যাদির নাম করা যায়।

এ অঞ্চলের কৃষি-খামারে গবাদি পশুর স্থান উল্লেখযোগ্য। তবে এইসব পশু খুব উৎকৃষ্ট শ্রেণীর নয়।

খনিজ সম্পদ ও শিল্প : নিম্ন গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চল খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। এই সম্পদের মধ্যে কয়লা সর্বপ্রধান। এই কয়লা অঞ্চল আসানসোল, রানীগঞ্জ অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত। এখানকার কয়লা উৎকৃষ্ট বিটুমিনাস শ্রেণীর ও কোক উৎপাদনের উপযোগী। কয়লার পর চুল্লীমাটি, চীনামাটি, উলফ্রাম, লৌহ, ম্যাঙ্গানীজ ইত্যাদির স্থান।

শিল্পোপযোগী কয়লা সম্পদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ যথেষ্ট শিল্পোন্নত। বৃহদায়তন শিল্পের মধ্যে লৌহ-ইস্পাত শিল্প সর্বপ্রধান। বরাকর-কুলটি ও দুর্গাপুর অঞ্চল লৌহ-ইস্পাত শিল্পের প্রধান কেন্দ্র। এ ছাড়া নানা কারিগরি ও যন্ত্রপাতি নির্মাণশিল্প বিভিন্ন কেন্দ্রে বর্তমান। যেমন চিত্তরঞ্জনের রেল ইঞ্জিন, রিষড়ার হিন্দ্ মোটরস্, আসান-সোলের সাইকেল ও কলকাতা-হাওড়ার সন্নিকটে নানা যন্ত্রপাতি ও কল নির্মাণ শিল্প উল্লেখ্য।

এ অঞ্চলের দ্বিতীয় শিল্প বয়নশিল্প। বয়নশিল্পের মধ্যে পাট, কার্পাস, রেশম ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। পাটশিল্প প্রধানত হুগলী নদীর উভয় তীরে কেন্দ্রীভূত। ভারতের ৯০ শতাংশের অধিক পাটকল এই অঞ্চলে অবস্থিত। কার্পাস শিল্পও মুখ্যত নিম্ন হুগলী অববাহিকায় অবস্থিত। রেশম বয়নশিল্প মুর্শিদাবাদ ও বাঁকুড়া জেলায় সীমাবদ্ধ।

অন্যান্য শিল্পের মধ্যে রাসায়নিক, অ্যালুমিনিয়াম, কাগজ, চীনামাটি, রাসায়নিক সার, কাচ, চর্মশিল্প ও নানা কৃষিনির্ভর শিল্প যেমন ধান, চা, তেল, ময়দা, শর্করা, কাঠ, দুধ, পাঁউরুটি, বিস্কিট ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া কুটিরশিল্প পর্যায়ে নানা চারু-কারুশিল্প এ অঞ্চলে উল্লেখের দাবী রাখে।

যোগাযোগ ব্যবস্থা : এই অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা পর্যাপ্ত না হলেও সন্তোষ-জনক। তিনটি প্রধান রেলপথ যথা পূর্ব রেল, দক্ষিণ-পূর্ব রেল ও উত্তর-পর্ব সীমান্ত রেল এ অঞ্চলের মধ্য দিয়ে বিস্তৃত। হাওড়া, আসানসোল, খড়গপুর ও নিউ জলপাই-গুড়ি প্রধান প্রধান রেলকেন্দ্র।

এখানকার সড়কপথকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—জাতীয় সড়ক, রাজ্য সড়ক, জেলা সড়ক ও গ্রামীণ সড়ক। জাতীয় সড়ক ২ (গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড), ৬, ৩১, ৩৪ ও ৩৫ এই অঞ্চলের মধ্য দিয়ে বিস্তৃত।

কলকাতার উপকন্ঠে দমদম একটি আন্তর্জাতিক বিমানকেন্দ্র ও ভারতের সব কটি বৃহৎ নগরীর সঙ্গে যুক্ত। উত্তরে বাগ্‌ডোগ্‌রা, আমবাড়ী, জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার ক্ষুদ্রায়তন বিমানকেন্দ্র।

বসতি, শহর ও নগর : নিম্ন গাঙ্গেয় সমভূমির গ্রামবসতি ব্যাপক। ক্ষুদ্র, বৃহৎ নানা শ্রেণীর গ্রাম এখানে দ্রষ্টব্য। গ্রামীণ বসতিগৃহের বৈশিষ্ট্য চাল-

কলকাতার রাজপথ

নির্মাণে লক্ষণীয়। এখানে একচালা, দোচালা, চৌচালা, আটচালা নানা জাতীয় গৃহের সমাবেশ লক্ষ্য করার মত। বসতিগৃহ নির্মাণের উপাদান মৃত্তিকা, বেড়া, কাঠ, খড়, শণ, গোলপাতা, টালি, টিন, অ্যাস্‌বেস্‌টস্‌ ইত্যাদি। এ ছাড়া ইট, বালি, সুরকির পাকা বাড়িও নানা স্থানে দেখা যায়।

কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতা (জনসংখ্যা: ৩,১৪৮,৭৪৬) ভারতের বৃহত্তম নগরী। ১৯১১ সালে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হবার পূর্বে কলকাতাই ভারতের রাজধানী ছিল। হুগলী নদীতীরে এই বন্দর নগরীর বাণিজ্যিক গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসাবে কলকাতার অবদান অতুলনীয়। এই নগরীর সন্নিহিত অঞ্চল নানা শিল্পে সমৃদ্ধ।

হাওড়াঃ কলকাতা নগরীর বিপরীত দিকে হুগলী নদীর অপর তীরে হাওড়া এ অঞ্চলের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগর (জনসংখ্যা : ৭৩৭,৮৭৭)। এই নগর একটি অন্যতম বৃহৎ রেলকেন্দ্র। পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলকেন্দ্রের উৎপত্তি এই রেলকেন্দ্রে। হাওড়ার বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে যন্ত্রপাতি নির্মাণশিল্প প্রধান। এর শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেন ভারতে বৃহত্তম ও একটি উৎকৃষ্ট পর্যটনকেন্দ্র।

অন্যান্য শতাধিক শহরের মধ্যে দুর্গাপর শিল্পকেন্দ্র, বর্ধমান প্রশাসনিক ও শিক্ষাকেন্দ্র, আসানসোল শিল্প ও রেলকেন্দ্র, খড়গপুর রেল ও শিক্ষাকেন্দ্র, মুর্শিদাবাদ ঐতিহাসিক কেন্দ্র, নবদ্বীপ প্রাচীন সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, বহরমপুর, কৃষ্ণনগর, শিলিগুড়ি প্রভৃতি প্রশাসনিক, যোগাযোগ, শিল্প ও বাণিজ্যকেন্দ্র (মানচিত্র ১৩)। বোলপুরের নিকট শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র শান্তিনিকেতন পশ্চিমবঙ্গের গৌরবের বস্তু।

পঞ্চম অধ্যায়

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা

অবস্থান: ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ভারতের মহা-সমভূমির পূর্বভাগ। ভারতের পূর্ব সীমায় মিকির পর্বত, উত্তর কাছাড় পর্বত ও কাছাড় জেলা ছাড়া সমস্ত আসাম রাজ্য এই উপত্যকার অন্তর্গত। পশ্চিমে ধুবড়ি থেকে পূর্বে সদিয়া অতিক্রম করে ৫৬,৭২৪ বর্গ কি জুড়ে এই অঞ্চল বিস্তৃত। উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণে পর্বতবেষ্টিত ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা দীর্ঘ ও সংকীর্ণ। বিভিন্ন দেশ ও রাজ্যের সান্নিধ্যে এ অঞ্চলের রাজনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। এর উত্তরে ভুটান ও অরুণাচল; পূর্বে অরুণাচল ও নাগাল্যাণ্ড; দক্ষিণে মিকির, রেঙমা পাহাড়, মেঘালয় ও পশ্চিমে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ অবস্থিত (মানচিত্র ১৫)। সন্নিহিত পার্বত্য রাজ্যগুলির অশান্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতি ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাকে নানা ভাবে প্রভাবিত করে। ভারতের অধিকাংশ স্থান থেকে দূরত্ব এ অঞ্চলকে বরাবরই স্বকীয়তা দান করে এসেছে। মুঘল যুগেও আসাম রাজ্যে কেন্দ্রের আধিপত্য বিস্তার হয়নি। এখানকার অধিকাংশ অধিবাসী মঙ্গোলশ্রেণীর এবং ব্রহ্মদেশের সান অঞ্চল থেকে আগত 'অহম' জাতির নামানুসারে 'আসাম' নামের উৎপত্তি বলে অনুমান করা হয়।

ভূপ্রকৃতি ও নদনদী: ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা সন্নিহিত পার্বত্যাঞ্চল থেকে ১৫০ মিটার সমোন্নতি রেখাদ্বারা চিহ্নিত। এই সমভূমি সঞ্চয়জাত সমভূমি। ব্রহ্মপুত্র নদ ও তার বিভিন্ন উপনদীর পলি দ্বারা এই সমভূমি গঠিত হয়েছে। এই পলির গভীরতা প্রায় ১৫০০ মিটার। সদিয়া থেকে ধুবড়ী পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার ঢাল সামান্য। পূর্বে এর উচ্চতা ১৩০ মি ও পশ্চিমে ৩০ মিটার মাত্র। এই উপত্যকা পূর্বে প্রশস্ত ও মধ্যভাগে মিকির, রেঙমা পাহাড় ও মেঘালয় মালভূমির সান্নিধ্যে সংকীর্ণ। পশ্চিম ভাগে এই উপত্যকা পুনরায় প্রশস্ত (মানচিত্র ১৫)।

সঞ্চয়জাত সমভূমি হলেও উপনদীসমূহের ক্ষয়কার্যের ফলে এই উপত্যকায় পর্বত ও মালভূমির শিলাময় ভূভাগ বর্তমান। যেমন তেজপুর ও মিকির পাহাড় অঞ্চল থেকে পশ্চিমে ধুবড়ী পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদের উভয় পার্শ্বে যথেষ্ট বিচ্ছিন্ন ক্ষয়জাত পাহাড় দেখতে পাওয়া যায়। এই সমভূমির উত্তর ভাগে হিমালয় পর্বত খাড়া ভাবে উঠে গেছে। কিন্তু দক্ষিণে মেঘালয় মালভূমি, নাগা-পাতকই-মিকির-রেঙমা পার্বত্যাঞ্চল ক্রমশ উঁচুতে উঠেছে; তার সীমারেখা অসম। ব্রহ্মপুত্রের উত্তরের সমভূমি দক্ষিণ

মানচিত্র ১৫

ভাগের চেয়ে প্রশস্ত। হিমালয় ও পূর্ব-পার্বত্য ভাগের দুর্বল অঞ্চলের সন্নিহিত হওয়ায় এখানে ভূমিকম্পের প্রকোপ যথেষ্ট।

এই উপত্যকার প্রধান নদ ব্রহ্মপুত্রের আয়তন ও প্রবাহ বিস্ময়কর। কৈলাস-পর্বতমালায় উৎপন্ন তিব্বতের সাংপো নদী ডিহং নদী রূপে ব্রহ্মপুত্রে মিলিত হবার সময় নামচা-বারোয়ার নিচে ৫৪৮৫ মি গভীর গিরিখাতের সৃষ্টি করেছে। ডিহং-ডিবং-লোহিত নদীর সঙ্গমস্থল অতি প্রশস্ত। চরম মুহূর্তে যখন ব্রহ্মপুত্র বরফগলা জল ও বৃষ্টিজলে যুগপৎ পুষ্ট হয় তখন তা স্থানে স্থানে ৮ কি মি পর্যন্ত প্রশস্ত হয়। সমভূমিতে প্রবাহিত হবার সময় ব্রহ্মপুত্র নদ বহু ধারায় বিভক্ত এবং স্থায়ী ও অস্থায়ী চরে পূর্ণ। এই নদের বন্যা সন্নিহিত অঞ্চলের বসতি ও কৃষিকার্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। ভয়াবহ বন্যায় সম্পত্তির প্রচণ্ড ক্ষতি হয়। নদীতীরের অবিরত ক্ষয় নদীবক্ষকে পলিদ্বারা ভরাট করে ফেলায় বর্ষাকালীন বিপুল জলপ্রবাহ বন্যার সৃষ্টি করে।

ব্রহ্মপুত্রের বহু দক্ষিণবাহিনী ও উত্তরবাহিনী উপনদী বর্তমান। এদের মধ্যে ৩৫টি উপনদী উল্লেখযোগ্য। হিমালয় থেকে প্রবাহিত দক্ষিণবাহিনী উপনদীর মধ্যে সুবনসিরি, ভারেলি, ধানসিরি, বার নদী, পাগলাদিয়া, মানস ও সঙ্কোষ প্রধান। দক্ষিণে উত্তরবাহিনী ও পশ্চিমবাহিনী প্রধান প্রধান উপনদী লোহিত, ডিহং, বুড়ি ডিহং, ধানসিরি, কালাং ইত্যাদি (মানচিত্র ১৬)। উত্তরে হিমালয়ের নদীগুলি তরাই অঞ্চলে বহু অন্তর্দেশীয় বদ্বীপের সৃষ্টি করে বহু ধারায় প্রবাহিত হয়। ব্রহ্মপুত্রের পলিবাঁধের জন্য এইসব নদী অনেক ক্ষেত্রে দক্ষিণবাহিনী হবার আগে মূল নদের সঙ্গে সমান্তরালভাবে বয়ে গেছে। ফলে এই নদীসমূহের গতি অতি ধীর ও গতিপথ বিল, অশ্বখুরাকৃতি হ্রদ ও জলাভূমিতে পূর্ণ।

জলবায়ু: সুউচ্চ হিমালয় ও পর্বতবেষ্টিত সংকীর্ণ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার জলবায়ু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ভারতের মহাসমভূমির অংশবিশেষ হলেও এ অঞ্চলের জলবায়ু পশ্চিমের গাঙ্গেয় সমভূমি থেকে কিছুটা পৃথক। মৌসুমী জলবায়ুর অন্তর্গত আসাম উপত্যকা সাধারণভাবে গ্রীষ্মকালীন বৃষ্টি ও শুষ্ক শীতকালের দেশ। তবু বিভিন্ন ঋতুতে আবহাওয়া পর্যবেক্ষণে এখানে নানা বৈচিত্র্য দেখা যায়। জলবায়ু বিচারে এই অঞ্চলে চারটি ঋতু লক্ষ্য করা যায়। যেমন (ক) শীতকাল; (খ) প্রাক্-মৌসুমী গ্রীষ্মকাল; (গ) মৌসুমী কাল ও (ঘ) অপসৃয়মান মৌসুমী কাল। এই সব ঋতু দক্ষিণের আর্দ্র বায়ু ও পশ্চিমের মহাদেশীয় বায়ু ছাড়াও স্থানীয় পার্বত্য ও উপত্যকা বায়ুপ্রবাহ দ্বারা প্রবাহিত।
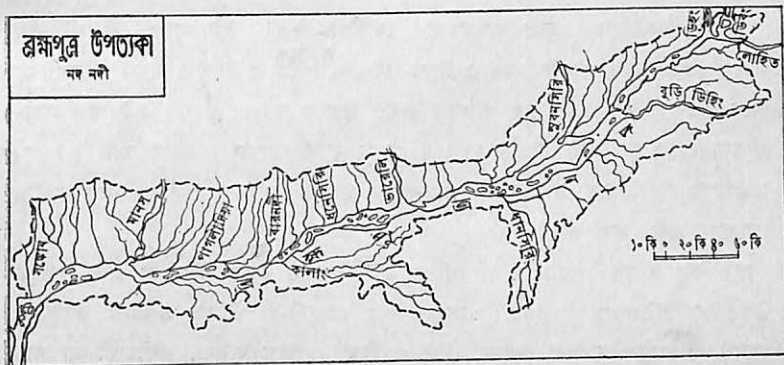
মানচিত্র ১৬

শীতকালে এ অঞ্চলে আবহাওয়া সাধারণ নিয়মে শীতল ও শুষ্ক। এ সময় গড় উত্তাপ ১২·৮° সেন্টিগ্রেডের মত। বৃষ্টির পরিমাণ ১১·৪ সে. মি। এই ঋতুর লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ঘন কুয়াশা। বৎসরে ৬০ থেকে ১০০ দিন পর্যন্ত এই উপত্যকা কুয়াশাচ্ছন্ন থাকে। ব্রহ্মপুত্রের বিপুল জলরাশি ও সমভূমির বিল ও জলাভূমি প্রভৃতি থেকে বাষ্পীভবনের ফলে এই কুয়াশার সৃষ্টি হয়। স্থানীয় পার্বত্য বায়ুপ্রবাহের জন্য ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ সমভূমিতে এই কুয়াশার পরিমাণ অধিক।

প্রাক্ মৌসুমী কালে শীতের অবসান হয়ে উত্তাপ ক্রমে বাড়তে থাকে। এ সময়কার বজ্রপাতসহ বৃষ্টি উল্লেখযোগ্য। এই প্রকার আবহাওয়া-দুর্যোগকে 'কালবৈশাখী'র ঝড় বলা হয়। এছাড়া স্থানীয় ধূলিঘূর্ণীও এই ঋতুর অপর একটি বৈশিষ্ট্য। প্রাক্ মৌসুমী কালে গড় উত্তাপ ২৩° সে. ও বৃষ্টিপাত প্রায় ৫২ সে। এই সমগ্র বৃষ্টিপাত কালবৈশাখীর ঝড় থেকে ঘটে থাকে। কালবৈশাখী ঝড়ের সংখ্যা পূর্বদিকে ১০০-এর অধিকও হতে দেখা যায়। মার্চ মাস থেকে এই ঋতুর সূচনা।

মৌসুমী ঋতুতে স্থানীয় নিম্নচাপের জন্য দক্ষিণ ও পশ্চিম থেকে আর্দ্র মৌসুমী বায়ু আসাম উপত্যকা অভিমুখে প্রবাহিত হয়। বঙ্গোপসাগর থেকে সংপৃক্ত বায়ু প্রথমে ব্রহ্মদেশের আরাকান পর্বতে বাধা পেয়ে উত্তর-পশ্চিমে প্রথমে গতি পরিবর্তন করে। অপর শাখা মেঘালয় মালভূমি অতিক্রম করে এখানে প্রবেশ করে ও এই দুই শাখা উত্তরে হিমালয়ে বাধা পেয়ে ওপরে ওঠে এবং ক্রমে শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি ঘটায়।. কিন্তু প্রথমে মেঘালয় ও আরাকান অঞ্চলে বৃষ্টিপাত ঘটায় এই উপত্যকা কিছুটা বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। উপত্যকার দক্ষিণভাগ সোজাসুজি বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চলে পড়ায় উত্তরভাগ অপেক্ষা বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম। মৌসুমী কালে তাপমাত্রা ২৭° সে ও বৃষ্টিপাত ১৭৫ সে মি এর অধিক। জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই ঋতু স্থায়ী হয়।

অক্টোবর-নভেম্বর মাস অপসৃয়মান মৌসমী ঋতু। এই সময় মৌসুমী বায়ু ক্রমশ দুর্বল হয়ে অপসারিত হয় ও উত্তর-পর্ব আয়ন বায়ু প্রতিষ্ঠিত হয়। অক্টোবর মাস থেকে উত্তাপ ও বৃষ্টির পরিমাণ ক্রমশ কমতে থাকে। ফলে এই ঋতু আব-হাওয়াগত ভাবে অতি মনোরম। এ সময় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ মাত্র ১৫ সে। সাধারণভাবে আসাম উপত্যকার জলবায়ুর একটা সমরূপ থাকলেও বহু স্থানীয় তারতম্য লক্ষ্য করা যায়।

স্বাভাবিক উদ্ভিদ: খর তাপ, পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত ও উর্বর মৃত্তিকার জন্য ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা উদ্ভিদসম্পদে সমৃদ্ধ। নানাজাতীয় স্বাভাবিক উদ্ভিদ এখানে বর্তমান। যেমন, চিরহরিৎ বৃক্ষের অরণ্য, মিশ্র পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য, পর্ণমোচী বা পান অরণ্য, সাভানা অঞ্চল ইত্যাদি। চিরহরিৎ বৃক্ষের অরণ্য প্রধানত পূর্বভাগে লখিমপুর ও শিবসাগর জেলায় সীমাবদ্ধ। এই গহন অরণ্যের বৃক্ষ দীর্ঘ, বলিষ্ঠ ও পত্রবহুল। এইসব বৃক্ষের বৈশিষ্ট্য অতিবৃষ্টি অঞ্চলের অনুরূপ। এখানকার প্রধান প্রধান গাছ জলং, নাহোর, জুতুলি, গামারি, কদম, অগরু, আমারি, ধূপ, তিতা চম্পা, সাম ইত্যাদি।

মিশ্র পাতাঝরা বৃক্ষের অরণ্য নিম্ন ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বর্তমান। এই অরণ্যের আঙিনা ছাউনি-ঘাসে আবৃত থাকে। এখানকার উল্লেখ্য বৃক্ষ ওডাল, সিমুল, বাজাউ, সিধা, শাল প্রভৃতি।

কামরূপ, গোয়ালপাড়া ও নওগাঁও জেলার পশ্চিমে বিস্তীর্ণ পাতাঝরা শাল গাছের অরণ্য দেখা যায়। শাল গাছের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। মাকরী, শাল, সিধা ও সাম শালের সহচর বৃক্ষ। প্লাইউড্ শিল্পে এইসব বৃক্ষের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য।

বসতি অঞ্চল বা গ্রামাঞ্চলের শুষ্ক ভূভাগে সাভানা জাতীয় উদ্ভিদ দেখা যায়। নদীতীরেও সাভানা জাতীয় ঘাস ও খাগড়া জন্মে থাকে। এদের মধ্যে খের, একারা ও কাহুয়া উল্লেখযোগ্য।

উল্লিখিত বৃক্ষরাজি ছাড়া আসাম উপত্যকার চিরহরিৎ বাঁশ, বেত ও নল প্রভৃতি

গাছ প্রসিদ্ধ। সর্বত্র দেখা গেলেও পূর্ব-আসামেই বাঁশের প্রাচুর্য। বেত জলা অঞ্চলে জন্মায়। সর্বতোভাবে এখানকার অরণ্যসম্পদ অত্যন্ত মল্যবান।

কৃষিকার্য: আসাম উপত্যকায় ৬৭'৫ শতাংশ অধিবাসী কৃষিজীবী ও অপর ১০ শতাংশ অধিবাসী বাগিচাচাষ, পশুপালন ও অন্যান্য কৃষিশ্রেণীয় কাজে লিপ্ত।

এই অঞ্চলে জমির ব্যবহার ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে পৃথক। কৃষিজমি ও অরণ্যজমির পরিমাণ প্রায় সমান সমান। কৃষিজমির অধিকাংশ খাদ্যফসল উৎপাদনে ব্যবহৃত। নিচের তালিকায় বিভিন্ন প্রকার ফসলের জমি ব্যবহারের নিদর্শন পাওয়া যায়।

খাদ্য ফসল—৭৭'১ শতাংশ

বাণিজ্যিক ফসল—২১'৪ শতাংশ

(চা, পাট, তামাক, ইক্ষু ও তৈলবীজ)

অন্যান্য ফসল—১'৫ শতাংশ

(সবজি, আলু, ফল, তুলো ইত্যাদি)।

খাদ্য ফসলের মধ্যে ধান সর্বপ্রধান। ধানের জমির পরিমাণ প্রায় ৭২'৮ শতাংশ। ধানের পরই চায়ের স্থান।

আসাম উপত্যকায় প্রায় ৭০০টি চা-বাগিচা আছে। এগুলি প্রধানত লখিমপুর, শিবসাগর ও দারাং জেলায় কেন্দ্রীভূত। আসামের চা নির্যাসের জন্য বিখ্যাত এবং একটি প্রধান রপ্তানী দ্রব্য।

চায়ের পর পাটের নাম উল্লেখ করা যায়। আসাম ও উত্তর-আসামের দারাং জেলা পাট উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ। পাট একটি মূল্যবান বাণিজ্যিক ফসল।

পাটের পর তৈলবীজ ও ডালের স্থান। গোয়ালপাড়া, কামরূপ, নওগাঁও ও দারাং জেলায় এই সব ফসল উৎপন্ন হয়। আসাম উপত্যকার প্রায় সর্বত্র ছোট ছোট ক্ষেতে ইক্ষু জন্মায়। ইক্ষুজমি পরিমাণে অল্প হলেও এই ফসলের মূল্য আসামে সমধিক। তামাক এই অঞ্চলের পশ্চিম ভাগে সামান্য পরিমাণে উৎপন্ন হয়। অন্যান্য ফসলের মধ্যে আলু ও নানাবিধ সবজির অর্থনৈতিক মূল্য যথেষ্ট।

খনিজ সম্পদ ও শিল্প: আসাম উপত্যকার প্রধান খনিজ সম্পদ পেট্রোলিয়ম ও কয়লা। এখানে উত্তর-পূর্ব ভাগে ডিব্রুগড় মহকুমায় অধিকাংশ পেট্রল পাওয়া যায়। অন্যান্য পেট্রোলিয়ম-সঞ্চিত স্থানের মধ্যে ডিগবয়, নাহারকাটিয়া, মোরান ও রুদ্র-সাগরের নাম উল্লেখযোগ্য। নাহারকাটিয়া ও মোরানের পেট্রোলিয়ম অঞ্চলে প্রচুর স্বাভাবিক গ্যাসও বিদ্যমান।

এই উপত্যকার দক্ষিণপূর্ব ভাগে লেডো-মাকুম, জয়পুর-দিল্লী ও নাজিরা অঞ্চলে কয়লা পাওয়া যায়। এই কয়লায় ছাই-এর ভাগ কম হলেও সালফারের পরিমাণ যথেষ্ট। রানীগঞ্জ-ঝরিয়ার কয়লার মত এই কয়লা উৎকৃষ্ট নয়। রেলপথ, লোহা-

পিতলের চুল্লী, ইটের ভাঁটি, স্টীমার, চা-কারখানা, নানা শিল্প ও গার্হস্থ্য প্রয়োজনে এই কয়লার ব্যবহার হয়।

খনিজ তেল ও কয়লার পর চুল্লীমাটি এই উপত্যকার তৃতীয় প্রধান খনিজ সম্পদ। কয়লা অঞ্চলে অধিকাংশ চুল্লীমাটির সন্ধান মেলে। সম্প্রতি গোয়ালপাড়া ও কামরূপে লৌহ-আকরিক আবিষ্কৃত হয়েছে।

ব্রহ্মপত্র উপত্যকা শিল্পোন্নত অঞ্চল নয়। শিল্পক্ষেত্রে অনগ্রসরতার মূল কারণ: (ক) অবস্থানিক দূরত্ব বা বিচ্ছিন্নতা, (খ) শক্তির অভাব, (গ) অপ্রতুল যোগাযোগ ব্যবস্থা, (ঘ) মূলধনের অভাব ও (ঙ) স্থানীয় বাজারের অভাব ও সর্বোপরি শিল্প-উদ্দীপনার অভাব।

এখানকার প্রধান দুটি শিল্পকেন্দ্র (১) গৌহাটি অঞ্চল ও (২) ডিব্রুগড় অঞ্চল।

শ্রমশিল্পের মধ্যে কয়লা, খনিজ তেল ও স্বাভাবিক গ্যাস শিল্প, কামরূপের রাসায়নিক সার শিল্প, ইট-টালি শিল্প, চীনামাটি শিল্প, রেল-মোটর কারিগরি শিল্প প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পেট্রোলিয়ম পরিশোধন, কয়লা থেকে কোক তৈরি প্রভৃতি এ অঞ্চলের প্রধান শিল্প। এখানকার কারিগরি শিল্প ক্ষুদ্র প্রকৃতির ও তা প্রধানত মেরামতী শিল্প পর্যায়ের। তবে তিনসুকিয়া ও ডিগবয়ে দুটি বৃহৎ কারিগরি শিল্প বর্তমান। ডিব্রুগড়, তিনসুকিয়া ও জোড়হাটে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লৌহ ইস্পাত কারখানায় কৃষি ও চা-শিল্পের সরঞ্জাম প্রস্তুত হয়। বর্তমানে পূর্ব আসামে একটি সিমেন্ট শিল্পও গড়ে উঠছে।

কৃষিনির্ভর শিল্পের মধ্যে খাদ্য শিল্প, চা, বয়নশিল্প প্রধান। খাদ্যশিল্পের মধ্যে চাল, ময়দা, তেল, চিনি, ফল সংরক্ষণ, পাঁউরুটি ও দুগ্ধ শিল্প উল্লেখ্য। চা-শিল্প সর্বপ্রধান কৃষিনির্ভর শিল্প। লখিমপুর, শিবসাগর ও দারাং প্রধান চা-প্রস্তুত অঞ্চল।

বয়ন-শিল্পের মধ্যে শিলঘাটের পাটশিল্প ও জাগিরোডের রেশম শিল্প সাধারণ পর্যায়ের। কিন্তু এখানকার প্রধান বয়নশিল্প তাঁতশিল্প কুটিরশিল্প পর্যায়ের এবং সাধারণত স্ত্রীলোকদের পেশা। তাঁতে প্রস্তুত বিভিন্ন রেশমবস্ত্র বিখ্যাত। এদের মধ্যে এণ্ডি, মগা ও পট্ট উল্লেখযোগ্য। কামরূপ রেশমশিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ।

আসাম উপত্যকার কাঠ ও বেত থেকে নানা শিল্প গড়ে উঠেছে। যেমন কাঠচেরাই, প্লাইউড ও আসবাব শিল্প, দেশলাই শিল্প, খয়ের ও আগরতেল শিল্প ইত্যাদি।

এছাড়া মদ্রণশিল্প, বরফশিল্প, বিদ্যুৎ-বাতি শিল্প ও নানা মেরামতী শিল্প এখানে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে।

যোগাযোগ ব্যবস্থা: নদীবহুল এই উপত্যকার যোগাযোগ ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নয়। এখানকার রেলপথ প্রধানত মীটারগেজ শ্রেণীর। ব্রহ্মপত্রের উত্তর ও দক্ষিণ ভাগের সব শহর কেন্দ্র রেলপথে যুক্ত। ব্রহ্মপত্র সেতু নির্মাণের পর উত্তর-দক্ষিণে যোগাযোগ সহজতর হয়েছে।

রেলপথের মত সড়কপথও প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। ব্রহ্মপুত্রের উত্তর ও দক্ষিণ তীরে রেলপথের মত পৃথক পৃথক ভাবে সড়ক পথ প্রায় সমান্তরালভাবে বিস্তৃত। সড়কপথ চার প্রকারের : (১) জাতীয় সড়ক, (২) পূর্তবিভাগীয় সড়ক, (৩) জেলা সড়ক, (৪) গ্রামীণ সড়ক।

এই উপত্যকায় জলপথে নাব্যতা সারা বছর সমান থাকে না। বর্ষাকালে সাধারণ নিয়মেই নাব্যতা বৃদ্ধি পায়। ব্রহ্মপত্র, সুবনসিরি, বরাইল, পাগলাদিয়া, মানস, বুড়িডিহিং, ধানসিরি প্রভৃতি নাব্য নদী। একসময় ব্রহ্মপুত্র পথে কলকাতার সঙ্গে আসামের যোগাযোগ ছিল। দেশবিভাগের পর এই সুযোগের অবসান ঘটে। বর্তমানে আধুনিক পদ্ধতিতে জলপথে যোগাযোগের উন্নতির কথা চিন্তা করা হচ্ছে।

এ অঞ্চলে বিমানপথের প্রাধান্য যথেষ্ট। গৌহাটি, তেজপুর, জোরহাট, উত্তর লখিমপুর ও ডিব্রুগড়ে বিমানবন্দর বর্তমান। কলকাতার সঙ্গে এ অঞ্চলে বিমান-পথে নিয়মিত যাত্রী ও মাল আদান প্রদান হয়।

বসতি, শহর ও নগর : এই অঞ্চলের ৯৪ শতাংশের অধিক জনসংখ্যা গ্রামের অধিবাসী। ক্ষুদ্র-বৃহৎ নানাজাতীয় গ্রাম এখানে দেখতে পাওয়া যায়। এখানকার বানিয়াগঞ্জ গ্রাম পৃথিবীর বৃহত্তম গ্রাম বলে অভিহিত। গ্রামীণ বসতিগৃহ নানা প্রকারের হয়। গৃহের চালে দুটি ধাপ লক্ষ্য করার মত। বহু চাল কানা যুক্ত
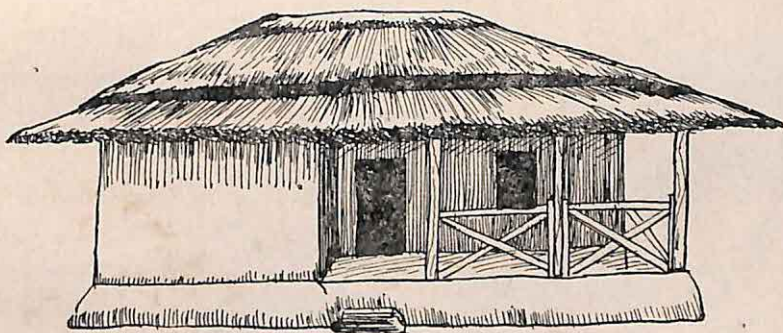
দ্বিতল চালের মাটির কুটির

হয়। গৃহ নির্মাণের উপকরণ মৃত্তিকা, কাঠ, বাঁশ, বেত, শণ, টিন, টালি ইত্যাদি। গৃহনির্মাণে বাঁশ ও বেতের ব্যবহার বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। আসামে ঘরবাড়ির আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য বৃহৎ শয়নকক্ষ ও প্রায় প্রতি গৃহে ক্ষুদ্র অতিথিকক্ষ।

পূর্বকালে আসাম উপত্যকায় জলপথের প্রাধান্যের জন্য বেশির ভাগ শহর ব্রহ্মপুত্র তীরে গড়ে উঠেছিল। বর্তমানে যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিবর্তন ও শিল্পবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অন্যত্রও শহর গড়ে উঠতে দেখা যায়।

এ অঞ্চলের সর্ববৃহৎ শহর গৌহাটি (জনসংখ্যা: ১৪৬,০২৬)। মহাকাব্যের যুগের প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর নগর গৌহাটি অঞ্চলেই অবস্থিত ছিল। প্রশাসনিক কার্য ছাড়াও গৌহাটি শহরের বাণিজ্য ও শিল্পকার্য উল্লেখযোগ্য। গৌহাটির কাছে নুনমাটিতে সাম্প্রতিক কালে প্রতিষ্ঠিত তৈল-পরিশোধনকেন্দ্র এই শহরের বাণিজ্যিক গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি করেছে।

এখানকার দ্বিতীয় বৃহৎ শহর **ডিব্রুগড়** (জনসংখ্যা: ৮০,৩৪৮)। ডিব্রুগড়ের তৈলশিল্প উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য প্রধান শহরগুলি প্রশাসনিক কার্য, পরিবহণকেন্দ্র, বাণিজ্যকেন্দ্র ও তৈলশিল্পকেন্দ্র রূপে গড়ে উঠেছে। যেমন **জোরহাট, শিবসাগর** প্রশাসনিক কেন্দ্র; **তেজপুর** পরিবহণ কেন্দ্র; **ধুবড়ী, নওগাঁও** বাণিজ্য কেন্দ্র এবং **ডিগবয়, তিনসুকিয়া, নাহারকাটিয়া** ইত্যাদি তৈলশিল্প কেন্দ্র।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মরুস্থলী

আরাবল্লী পর্বতের পশ্চিমে ভারতের উষর প্রান্তর মরুস্থলী। 'মরু' শব্দের অর্থ মৃত। 'স্থলী'র অর্থ দেশ। অর্থাৎ মৃতের দেশ। এই মরুস্থলীই ভারতের বিখ্যাত থর মরুভূমি। অতি শুষ্ক আবহাওয়া, প্রখর উত্তাপ ও দুস্তর বালুকাভূমি এই অঞ্চলকে মরুস্থলী নামে পরিচিত করেছে।
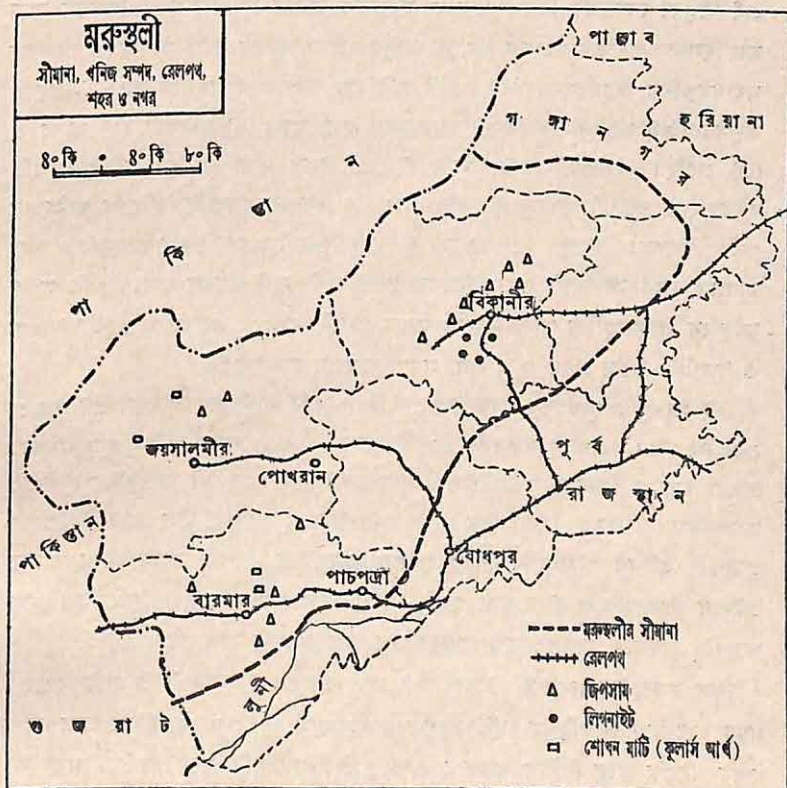
মানচিত্র ১৭

অবস্থান: রাজস্থান রাজ্যের পশ্চিমে মরুস্থলী ভারতের মহাসমভূমির অংশ বিশেষ। বারমার, যোধপুর, নগর, ও চুরু জেলার পশ্চিমাংশ ও সম্পূর্ণ বিকানীর ও জয়সালমীর জেলা মরুস্থলীর অন্তর্গত। এর উত্তরে গঙ্গানগর, হরিয়ানা ও পাঞ্জাব, পূর্বে রাজস্থানের পূর্বাংশ, পশ্চিম ও দক্ষিণে পাকিস্তান ও গুজরাট (মানচিত্র ১৭)। এই অঞ্চলের আয়তন ৬০,০০০ বর্গ কিলোমিটার। শতাব্দীব্যাপী মরুস্থলী রাজ-পরিবার শাসিত অঞ্চল ছিল এবং এর নাম ছিল রাজপুতানা (রাজপুতানার অর্থ রাজ-পুত্র শাসিত)। বহু ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল এই রাজপুতানা। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত রাজ্য পুনর্গঠনের যুগে এইসব ক্ষুদ্ররাজ্য একত্রিত হয়ে রাজস্থানের পশ্চি-মাংশে পরিণত হয়। পাকিস্তানের সন্নিহিত হওয়ায় এই অঞ্চলের রাজনৈতিক বা আন্তর্জাতিক গুরুত্ব যথেষ্ট।

ভূপ্রকৃতি ও নদনদী: থর মরুভূমির অংশ হিসেবে মরুস্থলী প্রধানত বালুকাময়। এই বালুকা কোয়ার্টজ, ফেলস্‌পার ও হর্নব্লেণ্ড শিলার চূর্ণ বিশেষ। অনুমান করা হয় হিমালয় পর্বতের গঠনের পর এই বালুকাময় মরুভূমির সৃষ্টি হয়েছে। ভারতের মহাসমভূমির অন্তর্গত হলেও মরুস্থলী অবিচ্ছিন্ন বালুকাময় সমভূমি নয়। ভূপ্রকৃতি অনুসারে এই মরুভূমিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়: (১) মরুস্থলী, (২) বাগর ও (৩) রোহি। মরুস্থলী বালি, বালিয়াড়ি ও পাথর দ্বারা গঠিত। বালিয়াড়িগুলি অধিকাংশই অস্থায়ী বা স্থানপরিবর্তনশীল। এ ধরনের ভূপ্রকৃতি পশ্চিমে পাকিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত। 'বাগর' বা রাজস্থান বাগর লুনী নদী অববাহিকার তৃণভূমি অঞ্চল। বাগরের পূর্বে আরাবল্লী থেকে নিঃসৃত ছোট ছোট নদী তাদের দুপাশে পলি সঞ্চয় করে যে প্লাবনভূমির সৃষ্টি করেছে তাকে 'রোহি' বলে। এভাবে 'মরুস্থলী' 'বাগর' ও 'রোহি' পশ্চিম থেকে পূর্বে প্রায় সমান্তরালভাবে অবস্থিত।

এই মরুভূমি পূর্বে ৩২৫ মি উচ্চতাবিশিষ্ট এবং পাকিস্তান সীমান্তে এই উচ্চতা ১৫০ মি মাত্র। এভাবে মরুস্থলী সিন্ধু উপত্যকা ও কচ্ছ অঞ্চল অভিমুখে ক্রমনিম্ন। আগ্নেয়শিলা ও বিন্ধ্যযুগের স্তরীভূত শিলার অবস্থিতির ফলে এই মরুভূমির ভূপ্রকৃতি আন্দোলিত। উন্মুক্ত শিলারাশির মধ্যে বেলেপাথর, চুনাপাথর, নীস, গ্রানাইট ইত্যাদি প্রধান। এইসব প্রাচীন শিলারাশি ক্ষয়িত মালভূমির অংশ। কোন কোন স্থানের এইরূপ শিলারাশিকে 'টর' বলা হয়। অন্যত্র আবার গুহা ও গোলাকৃতি গর্ত দেখা যায়। এগুলিকে বালুপূর্ণ বায়ুপ্রবাহের ফল বলে অনমান করা হয়।

কিন্তু মরুস্থলীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বালু অবক্ষেপণ বালিয়াড়ি ও বালি পাহাড়। নানা ধরনের বালিয়াড়ি বা বালিয়াড়িপুঞ্জ এখানে দেখা যায়। বায়ুর গতি ও ঘাসগুচ্ছের ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন আকার ও আকৃতির বালিয়াড়ি গড়ে ওঠে। যথা (১) অনুদৈর্ঘ্য বালিয়াড়ি, (২) অর্ধচন্দ্রাকার বালিয়াড়ি ও (৩) অনুপ্রস্থ বালিয়াড়ি।

অনুদৈর্ঘ্য (longitudinal) বালিয়াড়ি উত্তর-পূর্ব থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে বিস্তৃত।

এইসব বালিয়াড়ির অক্ষ বিদ্যমান—বায়ুপ্রবাহের সঙ্গে সমান্তরাল। অর্ধচন্দ্রাকৃতি বালিয়াড়ি বায়ুর গতিপথে ক্রম ঢালু ও বিপরীত দিকে খাড়া। এইসব বালিয়াড়ি ১০০ থেকে ২০০ মিটার দীর্ঘ ও ১০ থেকে ২০ মিটার উচ্চ। এগুলি সাধারণত সঞ্চারমান। অর্ধচন্দ্রাকৃতি বালিয়াড়িকে বারখানও বলা হয়। সঞ্চারমান বালিয়াড়ির আঞ্চলিক নাম ধ্রিয়ান। অনুপ্রস্থ (Transverse) বালিয়াড়ি 'U' আকৃতির। বায়ুপ্রবাহের গতিপথে আড়াআড়ি ভাবে এরা গঠিত।

মরুস্থলীর পূর্বে উল্লেখযোগ্য নদী লুনী। এই নদী কচ্ছ উপসাগরে গিয়ে পড়েছে। একসময়ে এই নদীতে প্রচুর জল ছিল। এখন এই নদী প্রায় শুষ্ক। মরুভূমির বৃষ্টি কোন নদীখাতে সহজে প্রবাহিত হতে পারে না এবং তা স্বাভাবিক নিম্নভূমিতে বা হ্রদে জমা হয়। প্রখর উত্তাপে এসব হ্রদের জল সহজেই শুকিয়ে যায় ও হ্রদ-বা অঙ্কে শুধুমাত্র লবণ পড়ে থাকে। এইসব লবনাক্ত হ্রদকে প্লায়া বলে। এদের মধ্যে পাচপদ্রা উল্লেখযোগ্য। লবনাক্ত হ্রদের স্থানীয় নাম 'ধাঁদ'।

জলবায়ু: মরুস্থলী ভারতের শুধুমাত্র শুষ্কতম স্থান নয়—এখানকার গ্রীষ্মকালীন উত্তাপও সর্বাধিক। মার্চ মাসের মাঝামাঝি থেকে উত্তাপ বৃদ্ধি পেতে থাকে ও মে মাসে সর্বাধিক উত্তাপ অনুভূত হয়। এ সময় উত্তাপের মাত্রা ৪৩° থেকে ৫০° সে পর্যন্ত হতে পারে। গ্রীষ্মকালে দিনরাত্রির উত্তাপের পার্থক্য যথেষ্ট। ঐ সময় মাঝে মাঝেই ধূলিঝড় হয়। ধূলিঝড়ের সঙ্গে আকস্মিক বৃষ্টি হলে উত্তাপের মাত্রা কমে যায়। ধূলিঝড়ের প্রকোপ পুব থেকে পশ্চিমে বেশি। কিন্তু বজ্রপাতসহ ঝড়ের সংখ্যা পশ্চিম থেকে পূর্বে বেশি।

জুলাই ও সেপ্টেম্বর মাসে শুধুমাত্র বৃষ্টিপাত ঘটে। এই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অতি সামান্য অর্থাৎ ১২ থেকে ২৫ সেন্টিমিটার মাত্র। কিন্তু এই সামান্য বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তা লক্ষণীয়।

শীতকালে মরুস্থলীর শৈত্যের তীব্রতা যথেষ্ট। অনেক সময় তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নিচে নেমে যায় ও তুষারকণার সৃষ্টি হয়।

স্বাভাবিক উদ্ভিদ: বালি ও প্রস্তরময় মরুভূমিতে উদ্ভিদ প্রায় নেই বললেই চলে। স্থানে স্থানে কাঁটা ঝোপ ও ঘাস ছাড়া আর কোন উল্লেখযোগ্য গাছপালা দেখা যায় না। বড় গাছের মধ্যে বাবুলের আধিক্য লক্ষণীয়। পাচপদ্রা অঞ্চলের লবণাক্ত জমিতে কচুরিপানা জাতীয় গাছ জন্মায়। পাখরান থেকে জয়সালমীর পর্যন্ত মরু অঞ্চলে নানাজাতীয় ঘাস দেখা যায়। এই অঞ্চলকে উৎকৃষ্ট চারণভূমিতে পরিণত করা সম্ভব।

কৃষিকার্য: শুষ্ক পরিবেশ শুধুমাত্র জলের সান্নিধ্যে চাষ করা সম্ভব। সেচ-কার্যের অসুবিধার জন্য অধিকাংশ ভূমি অকর্ষিত থাকে। পশ্চিম ভাগ অপেক্ষা পূর্ব ও উত্তর দিকে কৃষিকার্যের সুযোগ বেশি। ভূভাগের অনুর্বরতা হেতু খামারের আয়তন

সাধারণত বৃহৎ। এখানকার উৎপাদিত ফসল সমূহ কঠোর পরিবেশের উপযোগী। বাজরা এ অঞ্চলে সর্বপ্রধান ফসল।

বাজরা চাষের জন্য জলসেচের প্রয়োজন হয় না। বালুকাময় মৃত্তিকা ও অনিশ্চিত সামান্য বৃষ্টিপাত বাজরা চাষের অন্তরায় নয়। মরুস্থলীর পূর্ব ভাগে এই ফসলের অধিক চাষ হয়।

অন্যান্য ফসলের মধ্যে গম, ছোলা ও ডাল উল্লেখযোগ্য। একমাত্র জলের সান্নিধ্য ও সেচকার্যের দ্বারা গম চাষ সম্ভব। এই কারণে গঙ্গানগর ও পূর্ব ও মধ্য মরুস্থলীতে গম জন্মায়। সর্বতোভাবে মরুস্থলীতে কৃষিকার্যের প্রধান অন্তরায় জলাভাব, লবণাক্ত জমি, ভূমিক্ষয় ও উদ্ভিদের নানাবিধ রোগ, পোকামাকড় ও পঙ্গপালের আক্রমণ প্রভৃতি।

ভবিষ্যতে সেচকার্যের যে পরিকল্পনা রয়েছে তা সম্পূর্ণ হলে কৃষিকার্যের প্রভূত উন্নতি হবে। এই পরিকল্পনা 'রাজস্থান খাল প্রকল্প' নামে পরিচিত। এই প্রকল্প
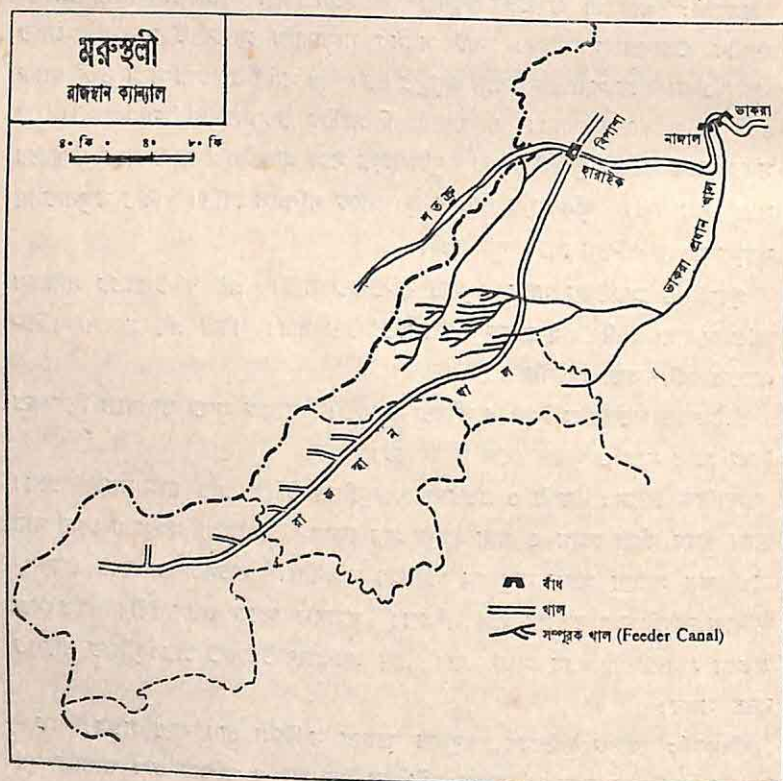
মানচিত্র ১৮

১২ লক্ষ হেক্টর জমিকে সিঞ্চিত করবে। শতদ্রু ও বিপাশার মিলনস্থলে হারাইক বাঁধ থেকে রাজস্থান খালের উৎপত্তি (মানচিত্র ১৮)। এর মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৮০৫ কি।

বর্তমানে জলসেচের প্রধান উপায় কূপ। কিন্তু কূপের জল অপ্রচুর হওয়ায় জলসেচ সারা বৎসর সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে ভূগর্ভস্থ জল সেচের জন্য ব্যবহার করলে কৃষিকার্য অনেক বেশি সমৃদ্ধি লাভ করবে।

মরুস্থলীর ভূভাগে পশুপালন একটি লাভজনক পেশা। মোট ভূভাগের দুই থেকে দশ শতাংশ অঞ্চলে পশুচারণ করা হয়। উট, ছাগল, ভেড়া ও মোষ মরুস্থলীর প্রধান পশুসম্পদ। এইসব পশু থেকে দুধ, পশম ও মাংস প্রয়োজনীয় উৎপন্ন দ্রব্য। পরিবহণ ও ভারবহনের জন্য উটের ব্যবহার সর্বজনবিদিত।

খনিজ সম্পদ ও শিল্প: এই অঞ্চলের উল্লেখ্য খনিজ সম্পদ জিপসাম, লিগনাইট কয়লা, শোধন মাটি (Fuller's earth), পাইরাইট ও শিলা ফসফেট। বিকানীর শহরের দক্ষিণে লিগনাইট কয়লা পাওয়া যায়। লিগনাইট উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা নয়। এই কয়লা রেলপথের সান্নিধ্যে অবস্থিত ও সড়কপথে বিকানীর শহরের সঙ্গে যুক্ত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে এই কয়লার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে ও বর্তমানে তা বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।

জিপসাম মরুস্থলীর একটি অমূল্য সম্পদ। রাসায়নিক সারে এর ব্যবহার সমধিক। শোধন মাটিতে অ্যালুমিনিয়ম, লোহা, চুন, ম্যাগনেসিয়া ও লবণ ইত্যাদি বর্তমান। এর নানাবিধ ব্যবহার লক্ষণীয়। বনস্পতি বা ভেষজ তেল, পেট্রোলিয়মজাত দ্রব্য পরিশোধনে এই মাটির প্রয়োজন হয়। এছাড়া জল পরিশোধন, বস্ত্রের তৈলাক্ত পদার্থ দুরীকরণে এর ব্যবহার হয়। অন্যান্য ব্যবহারের মধ্যে প্রসাধন সামগ্রী, বীজনাশক পাউডার, খাদ্যের রঞ্জনপদার্থ অনুসন্ধান উল্লেখযোগ্য।

এই অঞ্চলে কোন বৃহৎ শিল্প নেই। জল, শক্তি, পরিবহণ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা ও উপযুক্ত শ্রমশক্তির অভাব শিল্পায়নের পথে বিশেষ বাধাস্বরূপ।

এখানকার একমাত্র উল্লেখযোগ্য শিল্প লবণশিল্প। পাচপাদ্র এলাকা লবণ প্রস্তুতের জন্য প্রসিদ্ধ। এই লবণ সমুদ্র লবণের সদৃশ। এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ লবণ প্রস্তুতের অনুকূল। স্বল্প বৃষ্টিপাত ও উষ্ণ গ্রীষ্মকালের জন্য অতিরিক্ত মাত্রায় বাষ্পীভবন সংঘটিত হয়। পাচপদ্রার লবণ ৮৩ বর্গ কি জুড়ে এক অবনত অংশ থেকে সংগৃহীত হয়।

শক্তির উৎপাদন, জল সরবরাহ, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও কাঁচা মালের ওপর নির্ভর করে মরুস্থলীর জেলা সদরগুলিতে ও প্রধানত গঙ্গানগরে কৃষিভিত্তিক শিল্প ও নানাবিধ কুটির শিল্প গড়ে উঠেছে। যেমন, কার্পাস শিল্প, পশম শিল্প, ময়দা শিল্প, ধাতুশিল্প, কার্পেটশিল্প ইত্যাদি।

যোগাযোগ ব্যবস্থা: মরুস্থলীর যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত। এখানকার তিনটি

রেলপথ যথাক্রমে (১) লুনী জংশন থেকে গদ্‌রা সিটি; (২) মেরতা রোড শহর থেকে সুরাটগড়; (৩) যোধপুর পোখরান থেকে জয়সালমীর শহর পর্যন্ত বিস্তৃত। মরুস্থলীর পূর্বাঞ্চলেই রেলপথের বিস্তৃতি অধিক। রেলপথের মত সড়কপথের বিন্যাসও মরুস্থলীতে উন্নত নয়। বড় বড় শহরের মধ্যে সড়কপথের যোগাযোগ সাধারণ পর্যায়ের। বালিপ্রবাহ ও সঞ্চারমান বালিয়াড়ি যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রধান অন্তরায় (মানচিত্র ১৭)।
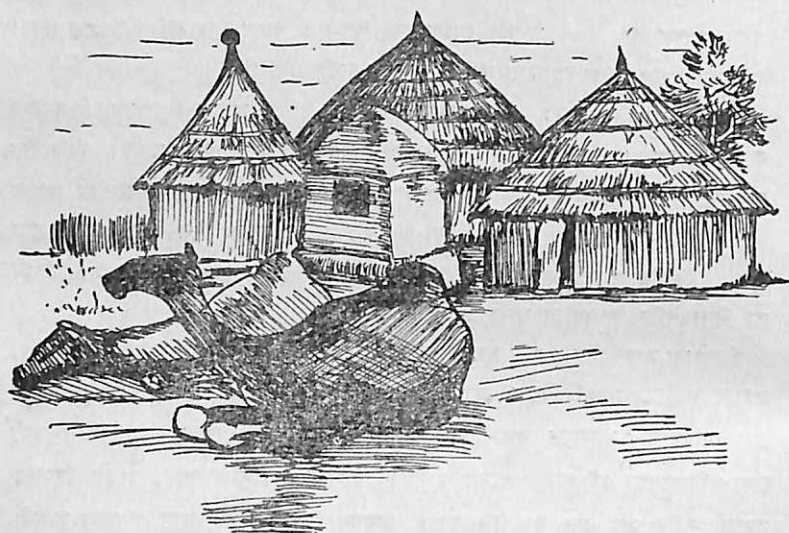
মরুস্থলীর গ্রাম

বসতি, শহর ও নগর: মরুস্থলীর অধিকাংশ লোক গ্রামে বাস করে। গ্রামগুলি আকারে ক্ষুদ্র ও বসতিগৃহ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। মরুস্থলীর গোলাকৃতি গৃহগুলির নাম 'ঝোন্‌পা'। এই গৃহের দেওয়াল মাটির ও ছাদ 'থিপদা' বা 'দেদো' ঘাসে আচ্ছাদিত। এই ঘাসের চালে বাজরার খড়ের দড়ির বেষ্টনী থাকে। মরুস্থলীর 'ঘর' নামে বসতিগৃহের দেওয়াল ও ছাদ মাটির এবং ছাদ কাঠের বর্গার ওপর সমতল। সমতল ছাদ বৃষ্টিহীন আবহাওয়ার জন্য করা সম্ভব। এখানে 'পাদেয়া' নামে গৃহগুলির রোদে শুকোনো ইটের দেওয়াল ও নিকৃষ্ট টালির ঢালু ছাদ। এছাড়া অন্যান্য বর্গাকৃতি গৃহও এখানে বর্তমান।

বিকানীর: এখানকার বৃহত্তম শহর বিকানীর। ১৯৭১ সালের গণনা অনুযায়ী এখানকার লোকসংখ্যা ১৮৮,৫১৮ জন। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২২৪ মি ঊর্ধ্বে এই শহর পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। যোধপুরের মত বিকানীরও প্রাচীর বেষ্টিত।

প্রাচীরের অভ্যন্তরে বৃহৎ বৃহৎ অটালিকা, মন্দির ও বিরাট দুর্গ বর্তমান। এর তিন দিক পরিখাবেষ্টিত। এই শহর অনেকটা বর্গাকার। এখানে প্রচুর মন্দির ও মসজিদ বর্তমান। বিকানীরের পশম, শাল, কম্বল ও কার্পেট শিল্প বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

ঝোন্‌পা

বারমার ও **জয়সালমীর** অন্যান্য উল্লেখযোগ্য শহর। পশ্চিম প্রান্তে ক্ষুদ্র শহর জয়সালমীর-এর রাজনৈতিক গুরুত্ব যথেষ্ট। (মানচিত্র ১৭)।

সপ্তম অধ্যায়

দাক্ষিণাত্যের মালভূমি

দাক্ষিণাত্যের মালভূমি ভারতের মহা সমভূমির দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত বিশাল এলাকা জুড়ে বিদ্যমান। এর উত্তর সীমা প্রথমে কচ্ছ রাণ থেকে আরাবল্লীর পশ্চিম ঢাল হয়ে প্রায় দিল্লী পর্যন্ত ও পরে গঙ্গা-যমুনা সমভূমির দক্ষিণ সীমা বরাবর রাজ-মহল পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত। পূর্বে এই মালভূমি গাঙ্গেয় সমভূমির পশ্চিম সীমা থেকে উপকূলীয় সমভূমির পশ্চিম সীমা ঘেঁষে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত এবং পশ্চিমে পশ্চিম উপকূলের পূর্ব সীমা বরাবর কচ্ছ রাণ পর্যন্ত বিস্তৃত (মানচিত্র ১৯)।
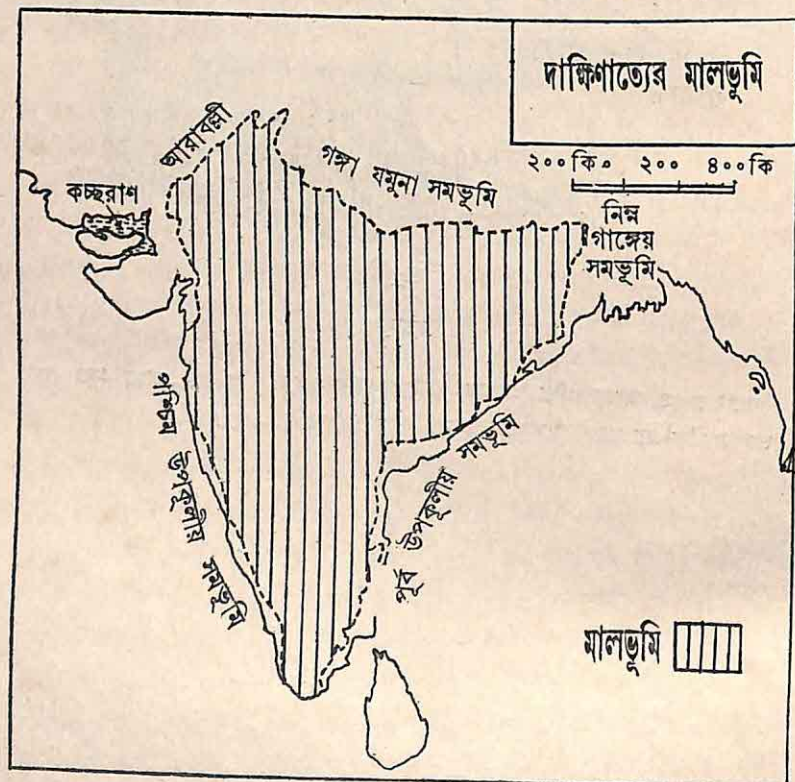
মানচিত্র ১৯

বর্তমান আলোচনায় এই মালভূমির সম্পূর্ণ অংশ অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এর শুধুমাত্র লাভা অঞ্চল, মহীশূর মালভূমি ও ছোটনাগপুর মালভূমির বিবরণ এখানে দেওয়া হল।

লাভা অঞ্চল

অবস্থান: দাক্ষিণাত্যের মালভূমির পশ্চিমে প্রায় সমগ্র মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ, রাজস্থানের দক্ষিণ-পূর্বের কিছু অংশ, গুজরাটের পূর্ব ভাগ ও মহীশূরের উত্তর ভাগ নিয়ে লাভা অঞ্চল গঠিত। (বর্তমান আলোচনায় মহীশূরের লাভা অঞ্চল মহীশূর মালভূমির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে)। লাভা অঞ্চল প্রায় ৩২০,০০০ ব কি আয়তন বিশিষ্ট। এই অঞ্চলের পশ্চিম সীমায় পশ্চিম উপকূল, গুজরাট ও রাজস্থান, উত্তরে রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশ, পূর্বে মধ্যপ্রদেশ ও অন্ধ্রপ্রদেশ ও দক্ষিণে মহীশূর রাজ্য (মানচিত্র ২০)।
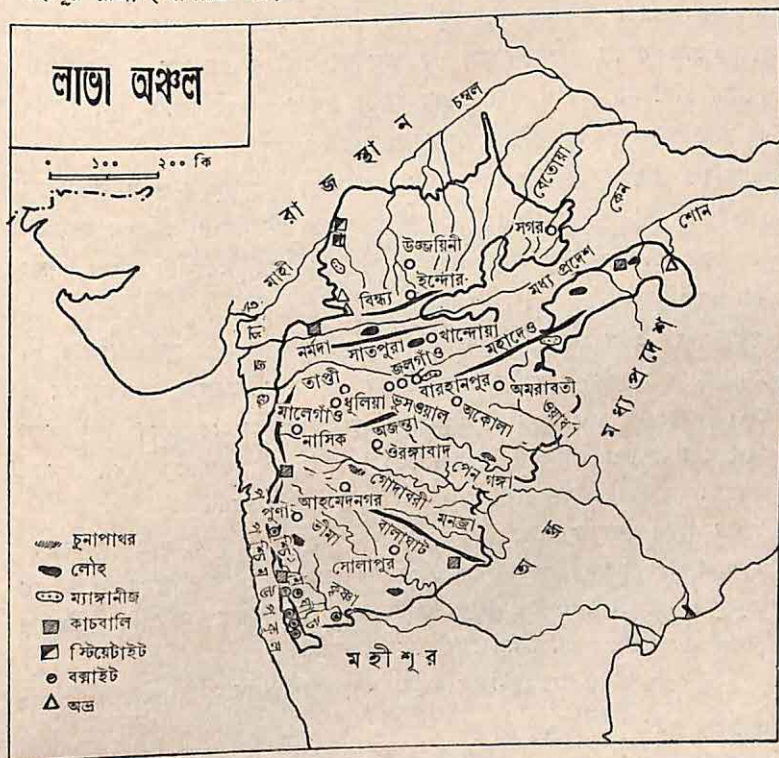
মানচিত্র ২০

ভূপ্রকৃতি ও নদনদী: লাভা অঞ্চল আশ্চর্য রকমের সমতলশীর্ষ-ধাপে গঠিত। এখানকার পাহাড়গুলিও সমতলশীর্ষ বিশিষ্ট। হিমালয় পর্বত গঠনের শেষ ভাগে

ভূভাগের অভ্যন্তর থেকে অসংখ্য ফাটল দিয়ে গলিত লাভা বেরিয়ে এসে ওপরে স্তরে স্তরে জমা হয়। স্তরে স্তরে বিন্যস্ত এই লাভাই বর্তমান সমতলশীর্ষবিশিষ্ট লাভা পর্বত ও লাভা অঞ্চলের সৃষ্টি করেছে। সমতলশীর্ষের জন্য এ অঞ্চলের ভূপ্রকৃতির একটা সমরূপ সর্বত্র লক্ষণীয়। লাভা ভূভাগ পূর্বে ক্রমশঃ ঢালু। এর পশ্চিমে পশ্চিমঘাট পর্বত ও পূর্বে প্রসারিত উত্তর থেকে দক্ষিণে বিন্ধ্য, সাতপুরা, অজন্তা, মহাদেও ও বালাঘাট পর্বত উল্লেখযোগ্য। এখানকার লাভা অবক্ষেপণের গড় গভীরতা ৬১০ মি থেকে ১৫০০ মি এবং কোথাও কোথাও তা ৩০০০ মি পর্যন্ত।

এ অঞ্চলের নদী প্রবাহকে উত্তরবাহিনী, পশ্চিমবাহিনী ও পূর্ববাহিনী এই তিন ভাগে ভাগ করা যায়। উত্তরবাহিনী নদীর মধ্যে চম্বল, বেতোয়া, কেন ও শোন প্রধান, পশ্চিমবাহিনী মাহী, নর্মদা ও তাপ্তী প্রধান এবং পূর্ববাহিনী নদীর মধ্যে ওয়ার্ধা, পেনগঙ্গা, গোদাবরী, মন্‌ত্রা, ভীমা ও কৃষ্ণা প্রধান (মানচিত্র ২০)।

জলবায়ু: লাভা অঞ্চলের জলবায়ু উষ্ণক্রান্তীয় শ্রেণীর। গ্রীষ্মকালে এখানকার সর্বোচ্চ তাপ ৪০° সে ও শীতকালের গড় তাপমাত্রা ২০° সে এর মত। পশ্চিমঘাট পর্বতের বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় বৃষ্টিপাত পশ্চিম থেকে পূর্বে বেশি। এই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ পশ্চিমে ৬০ সে ও পূর্বে ১৫০ সে।

স্বাভাবিক উদ্ভিদ: লাভা অঞ্চলের বৃষ্টিচ্ছায় অংশ তুলনামূলক ভাবে বৃক্ষবিরল ও এই সব বৃক্ষ হ্রস্ব আকৃতির। নাতিবৃষ্টি অঞ্চলে কাঁটাঝোপ ও গুল্ম জন্মায়। অপেক্ষাকৃত অধিক বৃষ্টির অঞ্চলে শুষ্ক পর্ণমোচী ও আর্দ্র পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য দেখা যায়।

কৃষিকার্য: এ অঞ্চলের প্রধান উপজীবিকা কৃষিকার্য ও মোট ভূভাগের প্রায় ৬০ ভাগ কৃষিযোগ্য ভূমি। লাভা অঞ্চলের প্রধান খাদ্য ফসল জোয়ার, বাজরা, গম ও ধান। এসব ফসলের মধ্যে প্রচুর ফলনের জন্য জোয়ার সর্বপ্রধান। প্রায় সারা বছর ধরে জোয়ার খারিফ (গ্রীষ্মকালীন) ও রবি (শীতকালীন) ফসল হিসাবে জন্মায়। বাজরা প্রধানত রবিশস্য ও তা নিকৃষ্ট জমির ফসল।

গম চাষের জন্য সেচের প্রয়োজন হয় ও ধান অপেক্ষাকৃত আর্দ্র অঞ্চলে জন্মায়।

তুলো লাভা অঞ্চলের একটি প্রধান ফসল। এখানকার কৃষ্ণমৃত্তিকা তুলো উৎপাদনের অনুকূল। তাপ্তী উপত্যকা, খান্দেশ ও বিদর্ভ অঞ্চলে তুলোর চাষ বেশি। একমাত্র তুলোই এখানকার প্রধান ফসল জোয়ারের প্রতিযোগী।

এ অঞ্চলের অপর উল্লেখ্য ফসল ইক্ষু। ইক্ষু উৎপাদনের জন্যও পরিমিত সেচের প্রয়োজন হয়।

খনিজ সম্পদ ও শিল্প: লাভা অবক্ষেপণের ফলে এ অঞ্চলের খনিজ সম্পদ গভীর ভাবে প্রোথিত এবং একমাত্র পশ্চিম, পূর্ব ও দক্ষিণ সীমান্তে কিছু খনিজ সম্পদের সন্ধান পাওয়া যায়। এইসব সম্পদের মধ্যে ম্যাঙ্গানীজ, চুনাপাথর, লৌহ আকরিক,

বক্সাইট, অভ্র, স্টিয়েটাইট, কাচ বালি উল্লেখযোগ্য। উৎপাদিত শক্তির মধ্যে কয়লা ও জলবিদ্যুৎ প্রধান।

এ অঞ্চলের শিল্পকেন্দ্র পুনা, সোলাপুর, নাসিক, সাতারা ইত্যাদি। এইসব স্থানের মধ্যে পুনা সর্বাপেক্ষা শিল্পোন্নত।

নানা শিল্পের মধ্যে কার্পাস বয়নশিল্প প্রধান। বিভিন্নজাতীয় কার্পাস বস্ত্র বয়নে এ অঞ্চলের প্রসিদ্ধি রয়েছে। অন্যান্য শিল্পের মধ্যে কাগজ শিল্প, চিনি পরিশোধন শিল্প ও তেল নিষ্কাশন শিল্পের উল্লেখ করা যায়।

যোগাযোগ ব্যবস্থা : লাভা অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা সন্তোষজনক। বোম্বাই-কলকাতা ও বোম্বাই-মাদ্রাজ রেলপথ এ অঞ্চলের মধ্য দিয়ে বিস্তৃত। এই দুই প্রধান রেলপথ ছাড়াও অন্যান্য প্রধান ও অনেক অপ্রধান রেলপথ এখানে বর্তমান।

সড়কপথের বিন্যাসও এখানে যথেষ্ট উন্নত। জাতীয় সড়ক, রাজ্য সড়ক, জেলা সড়ক ও অন্যান্য সড়ক এ অঞ্চলে বিদ্যমান।
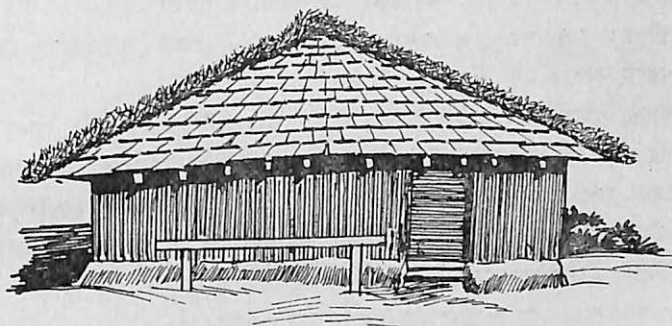
লাভা অঞ্চলের বাড়ি : নলের দেওয়াল, টালি ও ঘাসের ছাদ
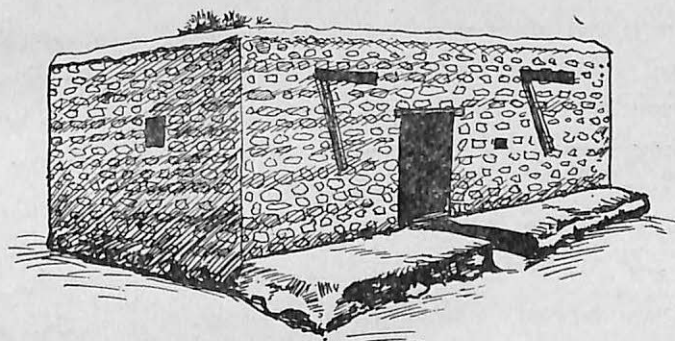
শুষ্ক অঞ্চলের বাড়ি : পাথরের দেওয়াল, মাটির ছাদ

পুনা, ঔরঙ্গাবাদ প্রভৃতি শহর বোম্বাই ও ভারতের অন্যান্য কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত।

বসতি, শহর ও নগর : লাভা অঞ্চলের গ্রামীণ বসতি কৃষিক্ষেত্রের সন্নিহিত ডাঙা জমি বা অযোগ্য পতিত জমিতে গড়ে উঠতে দেখা যায়। এখানে পুরোনো অনেক গ্রাম দেওয়াল বা প্রাচীর বেষ্টিত। পুরোনো দেওয়াল ও কোন কোন স্থানে তার সুদৃশ্য প্রবেশদ্বার সম্পর্কে গ্রামবাসীরা বেশ গর্বিত। কিন্তু এই দেওয়াল সংরক্ষণ বা মেরামতের দিকে তাদের বিশেষ নজর দেখা যায় না। কয়েকটি গ্রামের একটি সাধারণ বাণিজ্যকেন্দ্র বা 'হাট' থাকে। বসতিগৃহ মৃত্তিকা, নল, প্রস্তর, ঘাস, টালি ইত্যাদি দিয়ে গঠিত। দরিদ্র গ্রামবাসীর গৃহ নিকৃষ্ট শ্রেণীর। শুষ্ক অঞ্চলে বাড়ির ছাদ সমতলবিশিষ্ট।

পুনা : মুলা-মুথা নদীর সংযোগস্থলে পুনা (জনসংখ্যা : ৮৫৬,১০৫) একটি বিশিষ্ট শিক্ষা ও শিল্প কেন্দ্র। এখানকার সামরিক শিক্ষাকেন্দ্র, চলচিত্র ও টেলিভিসন ইনস্টিটিউট, ও আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র ভারতে বিশেষ পরিচিত।

সোলাপুর : সোলাপুর (জনসংখ্যা : ৩৯৮,৩৬১) একটি ঐতিহাসিক কেন্দ্র। এখানকার কার্পাস বয়ন শিল্প বিখ্যাত।

অন্যান্য শহরের মধ্যে ইন্দোর (৫৬০,৯৩৬), উজ্জয়িনী (২০৮,৫৬১), অমরাবতী, ঔরঙ্গাবাদ ইত্যাদি ঐতিহাসিক, প্রশাসনিক সাংস্কৃতিক, ও শিল্প কেন্দ্র। আহমদনগর, ভুসওয়াল, সাতারা, মালেগাঁও, নাসিক, ধূলিয়া প্রভৃতি শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র। সগর প্রশাসনিক ও শিক্ষাকেন্দ্র এবং বারহানপুর, খান্দোয়া ইত্যাদি যথাক্রমে ঐতিহাসিক, বাণিজ্যিক ও যোগাযোগ কেন্দ্র।

এ অঞ্চলের অজন্তা ও ইলোরার শিল্প-ভাস্কর্য বিশ্ববিখ্যাত।

মহীশূর মালভূমি

অবস্থান : লাভা অঞ্চলের দক্ষিণে প্রায় সমগ্র মহীশূর রাজ্য ও উত্তর-পূর্ব কেরালার সামান্য অংশ মহীশূর মালভূমির অন্তর্গত। এর অপর নাম কর্ণাটক মালভূমি। এই মালভূমির পশ্চিম সীমা পশ্চিমঘাট পর্বত, দক্ষিণ সীমা মোয়ার নদী ও দক্ষিণ-পূর্ব সীমা মোয়ার ও পালার নদীর অন্তর্বর্তী পাহাড়সমহ। মহীশর মালভূমির পূর্বে অন্ধ্র প্রদেশ ও পূর্বে ও দক্ষিণে তামিলনাড়ু, পশ্চিমে গোয়া ও কেরালা (মানচিত্র ২১)।

ভূপ্রকৃতি ও নদনদী : ভূপ্রকৃতি অনুসারে মহীশূর মালভূমিকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। পশ্চিমের উচ্চ বনভূমি বা 'মালনাদ' ও পূর্বের উন্মক্ত 'ময়দান' বা উন্মুক্ত উচ্চভূমি। খালনাদের গড় উচ্চতা ৬৯০ মি। এই উচ্চভূমি কুর্গের উত্তরে প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমঘাট পর্বতের মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে।

'ময়দান' উচ্চভূমির দক্ষিণে উচ্চতা ৬০০ থেকে ৯০০ মি। ময়দানের ভূভাগ
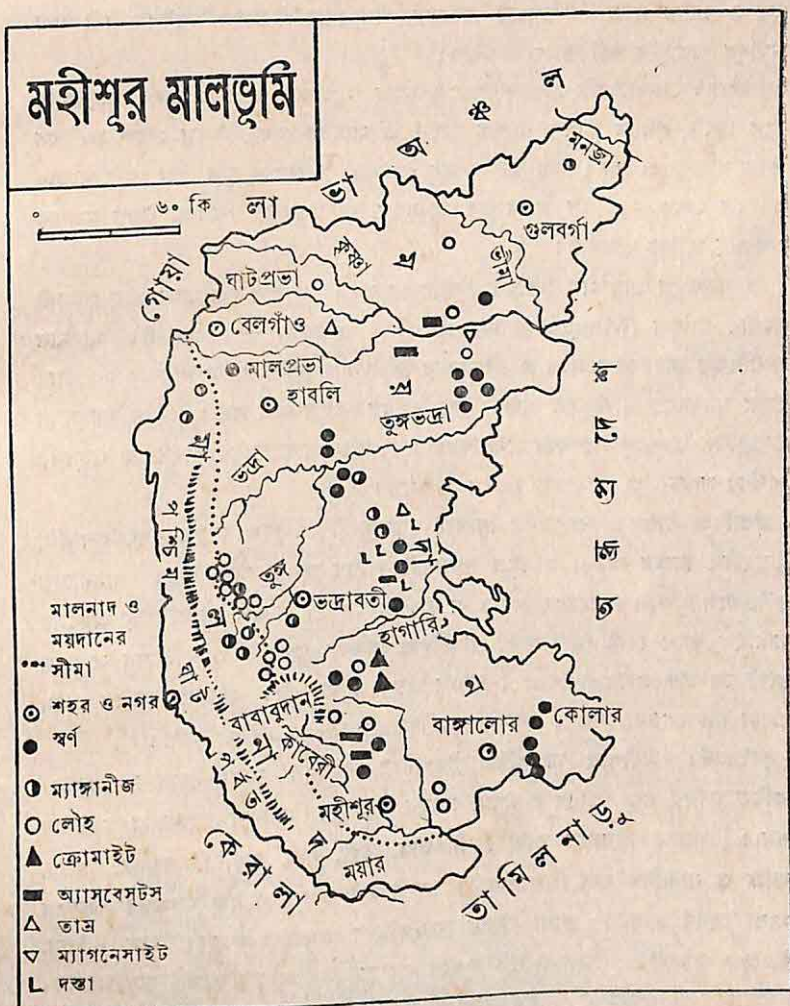
মানচিত্র ২১

অতিবন্ধুর। কর্ণাটক মালভূমি আগ্নেয়শিলা, রূপান্তরিত শিলা ও স্তরীভূত শিলায় গঠিত। এর প্রধান শিলা নীস, গ্রানাইট, সিস্ট, চুনাপাথর, স্লেট ইত্যাদি।

এখানকার নদীপ্রবাহকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। উত্তরে গোদাবরীর মন্‌জ্রা, মধ্যভাগে কৃষ্ণা, ও দক্ষিণে কাবেরী নদী প্রবাহ। মন্‌জ্রাপ্রবাহ উত্তরে বিদর জেলায় সীমাবদ্ধ। ভীমা, কৃষ্ণা, তুঙ্গ, ভদ্রা ও বেদবতীর মিলিত প্রবাহ কৃষ্ণা নদী নামে পরিচিত। কৃষ্ণার অন্যান্য উপনদী ঘটিপ্রভা ও মালপ্রভা। দক্ষিণে কাবেরী নদী

তুঙ্গ ও ভদ্রার ন্যায় পশ্চিমঘাট পর্বতের শীর্ষরেখায় উৎপন্ন। এইসব নদী দ্বারা মহীশূর মালভূমি গভীরভাবে ব্যবচ্ছিন্ন।

জলবায়ু: কর্ণাটকের জলবায়ু লাভা অঞ্চলের অনুরূপ ও প্রধানত উষ্ণ। ফেব্রুয়ারি মাস থেকে এখানে উত্তাপ বাড়তে থাকে ও সর্বোচ্চ তাপ ৪০° সে থেকে ৪২° সে পর্যন্ত হতে দেখা যায়। জানুয়ারি মাসে তাপমাত্রা সর্বাপেক্ষা কম এবং তা স্থানভেদে ২০° সে থেকে ২৮° সে পর্যন্ত হয়। বাৎসরিক উত্তাপের পার্থক্য উত্তর ময়দান অঞ্চলেই অধিক লক্ষণীয়।

এ অঞ্চলের প্রায় সব বৃষ্টি মৌসুমীকালে হয়। তথাপি মে মাসে প্রাক্-মৌসুমী কালীন বৃষ্টির (Mango showers) গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। মালনাদ কর্ণাটকের বৃষ্টিবহুল অংশ ও এখানকার উচ্চভূমিতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২০০ সে। উত্তর ময়দানের বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চলে মাত্র ৭০ সে বৃষ্টিপাত ঘটে। দক্ষিণ ময়দানের উচ্চভূমির জলবায়ু অনেকটা সমভাবাপন্ন। এখানে বাঙ্গালোরের বাৎসরিক উত্তাপের পার্থক্য সামান্য ও বৃষ্টিপাত ৯০ সে এর মত।

স্বাভাবিক উদ্ভিদ: জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এ অঞ্চলে হ্রস্ব বৃক্ষ, তৃণভূমি, চিরহরিৎ বৃক্ষের অরণ্য ও মিশ্র পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য দেখা যায়। মালনাদের বৃষ্টিবহুল অঞ্চলে চিরহরিৎ অরণ্য বা দীর্ঘ বৃক্ষরাজির সাক্ষাৎ মেলে, লাভা অঞ্চলের সন্নিহিত স্থানে ছোট ছোট বৃক্ষ, বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চলে তৃণভূমি ও দক্ষিণের সাধারণ বৃষ্টিপাত অঞ্চলে মিশ্র পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য দেখা যায়। শেষোক্ত অঞ্চলে প্রধান প্রধান বৃক্ষ সেগুন, শিশু ও চন্দন। মহীশূরের চন্দন কাঠ বিশ্ববিখ্যাত।

কৃষিকার্য: মহীশূরে মালভূমির উৎপাদিত ফসলের মধ্যে দানাশস্য প্রধান। কর্ষিত জমির ৫০ শতাংশ দানাশস্য চাষের অন্তর্গত। জোয়ার এখানকার সর্বপ্রধান শস্য। অন্যান্য ফসলের মধ্যে রাগী, ডাল, তুলা, ধান, ইক্ষু, চীনাবাদাম, মসলা, কফি ও নানাবিধ ফল উল্লেখযোগ্য। রাগী দক্ষিণ-পূর্বে অধিক জন্মায়। ডালের মধ্যে ছোলা প্রধান। তুলো উত্তরে কৃষ্ণ-মৃত্তিকা অঞ্চলের ফসল। ধান পশ্চিম, উত্তর-পশ্চিম এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বে খালসেচ অঞ্চলে অধিক পরিমাণে জন্মায়। মশলার মধ্যে এলাচ ও ফলের মধ্যে কলা প্রধান। মহীশূরের কৃষিকার্যে জলাধার সেচের প্রভাব অপরিসীম। প্রায় সর্বত্র কৃত্রিম ও স্বাভাবিক জলাধার থেকে সেচের ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়। মহীশূরের পশুপালন শিল্প ও দক্ষিণ-পূর্বে পশুপালন পেশা কৃষিকার্যের একটি বিশিষ্ট দিক।

খনিজ সম্পদ ও শিল্প: এই অঞ্চল খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। এই সম্পদের মধ্যে লৌহ, ম্যাঙ্গানীজ, ক্রোমিয়াম ও স্বর্ণ প্রধান। বাবাচুদান পাহাড়ে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর লৌহ পাওয়া যায়। সিমোগা ও বেলারীতেও কিছু লৌহের সন্ধান মেলে। বেলগাঁও, সিমোগা, চিত্রদুর্গা ও তুমকুর জেলায় ম্যাঙ্গানীজ পাওয়া যায়। কোলারে মূল্যবান

ধাতু স্বর্ণ বর্তমান। অন্যান্য খনিজ পদার্থের মধ্যে তাম্র, সীসা, বক্সাইট (অ্যালুমিনিয়ম আকরিক), গ্রাফাইট, অ্যাস্‌বেস্‌টস ও চুনাপাথরের নাম করা যায়।

মহীশূর মালভূমি শিল্লোন্নত অঞ্চল। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে জলবিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করে শিল্পপ্রগতির প্রচেষ্টা চলেছে। কাবেরী নদীর শিবসমুদ্রম প্রপাত, কৃষ্ণরাজসাগর বাঁধ, সরাবতী নদীর যোগ প্রপাত, ও সিমসা প্রধান জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র। এছাড়া তুঙ্গভদ্রা নদীতেও জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়।

এ অঞ্চলের কার্পাস বয়নশিল্প সর্বপ্রধান। এখানে ৩২০টির ওপর কাপড়ের কল রয়েছে। এ ছাড়া খনিজ সম্পদ উত্তোলন, কারিগরি, রাসায়নিক, খাদ্য, পানীয়, তামাক ইত্যাদি শিল্পও উল্লেখযোগ্য।

মহীশূরে বাঙ্গালোর জেলা সর্বাপেক্ষা শিল্পসমৃদ্ধ অঞ্চল। এখানকার বিমানশিল্প, ঘড়িশিল্প, মেশিনশিল্প, মেশিনটুল্‌স্ শিল্প ভারতে প্রসিদ্ধ। বিনির কারখানা এখানে অবস্থিত।

ভদ্রাবতীর লৌহ-ইস্পাত শিল্প দক্ষিণ ভারতে বৃহত্তম। বেলগাঁও-এ অ্যালুমিনিয়ম শিল্প, কোলারের স্বর্ণোত্তলন শিল্প, মাণ্ডিয়ার চিনি শিল্প উল্লেখযোগ্য।

যোগাযোগ ব্যবস্থা : মহীশূর মালভূমি অঞ্চলে রেলপথ অপেক্ষা সড়ক পথ প্রধানতর। সব শহর ও অন্যান্য স্থান সড়কপথে যুক্ত। সড়কপথের মধ্যে ৮০ শতাংশ জেলা ও গ্রামীণ সড়ক। রাজ্য ও জাতীয় সড়কের বিস্তৃতি তুলনায় কম। রেলপথের বিন্যাস মহীশূরে যথেষ্ট নয়। মাত্র ১৪টি শহর রেলপথে সরাসরি যুক্ত। অন্যান্য শহর রেলস্টেশন থেকে দূরে অবস্থিত। বিমানপথও এ অঞ্চলে পর্যাপ্ত নয়। একমাত্র বাঙ্গালোর শহর বিমানপথে বোম্বাই, দিল্লী ও মাদ্রাজের সাথে যুক্ত।

বসতি, শহর ও নগর : মহীশূরের গ্রাম বিক্ষিপ্ত, সন্নিবিষ্ট, রেখাকৃতি প্রভৃতি
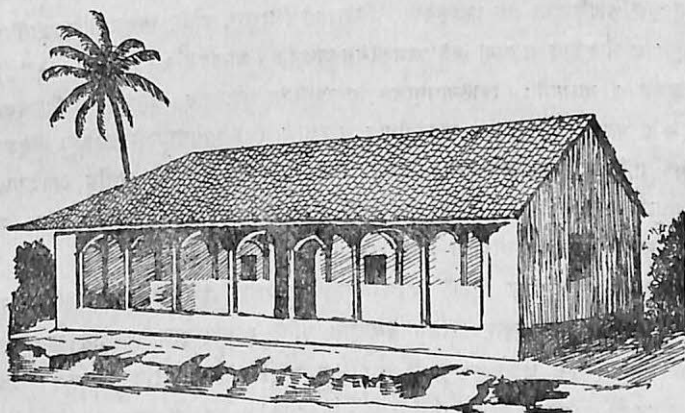
মহীশর—মাটি ও খোলার সুদৃশ্য কুটির

নানা প্রকারের দেখা যায়। গ্রামের বসতিগৃহও নানা প্রকারের হয়। গৃহের দেওয়াল মৃত্তিকা, প্রস্তর ও বাঁশের বেড়ায় তৈরি হয় ও ছাদে খড়, টালি, মৃত্তিকা ইত্যাদির ব্যবহার হয়। অধিকবৃষ্টি অঞ্চলের গৃহের ছাদ সাধারণত ঢালু করা হয় এবং অপেক্ষাকৃত শুষ্ক অঞ্চলের ছাদ সমতলবিশিষ্ট হয়।

মহীশূর রাজ্যের রাজধানী **বাঙ্গালোর** (জনসংখ্যা ১,৫৪০,৭৪১) একটি প্রধান সাংস্কৃতিক ও শিল্প কেন্দ্র। এই শহর ভারতের ষষ্ঠ নগরী। আধুনিক পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্মিত এই শহরের সৌন্দর্য সর্বজনবিদিত। এখানকার বাণিজ্যকেন্দ্র বা বাজার অতি সমৃদ্ধ। বাঙ্গালোরে প্রচুর প্রেক্ষাগৃহ আছে। বিভিন্ন ধাতু ও ভারী শিল্পের মধ্যে বিমান শিল্প, যন্ত্রপাতি নির্মাণ শিল্প ও ঘড়ি শিল্প উল্লেখ্য। এখানকার বয়নশিল্পও যথেষ্ট প্রসিদ্ধ।

মহীশূর (জনসংখ্যা : ৩৫৫,৬৮৫) : এই রাজ্যের পুরাতন রাজধানী। এই শহর মহীশূরের দ্বিতীয় বৃহৎ শহর। এখানকার রাজপ্রাসাদ ও অদূরে চামুণ্ডা দেবীর মন্দির দর্শনীয়।

অন্যান্য শহরের মধ্যে হাবলি, বেলগাঁও, গুলবর্গা, ভদ্রাবতী ইত্যাদির নাম উল্লেখ-যোগ্য। স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের জন্য ঐতিহাসিক স্থান হলেবীদ ও বেলুড় পর্যটকদের বিশেষ আকর্ষণ।

ছোটনাগপুর মালভূমি

অবস্থান : দাক্ষিণাত্যের মালভূমির উত্তর-পূর্ব প্রান্তে ছোটনাগপুর মালভূমি। এর উত্তরে উত্তর বিহার, পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের সমভূমি, দক্ষিণে ওড়িশা ও পশ্চিমে বাঘেলখণ্ড ও ছত্রিশগড় মালভূমি। ছোটনাগপুর অঞ্চল প্রধানত বিহারের অংশ হলেও পশ্চিম-বঙ্গের পুরুলিয়া জেলা এর অন্তর্ভুক্ত। বিহারের সিংভূম, রাঁচী, পালামৌ, হাজারীবাগ, ধানবাদ ও সাঁওতাল পরগনা এই মালভূমির অন্তর্গত (মানচিত্র ২২)।

ভূপ্রকৃতি ও নদনদী : ছোটনাগপুরের মালভূমিকে ভূপ্রকৃতি অনুসারে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় : (১) উত্তরে হাজারীবাগ মালভূমি, (২) মধ্যভাগে দামোদর উপত্যকা ও (৩) দক্ষিণে রাঁচী মালভূমি। প্রায় সমগ্র মালভূমি বিভিন্ন নদীর স্রোতধারায় গভীরভাবে ব্যবচ্ছেদিত। মধ্যভাগের নদী উপত্যকা প্রশস্ত ও সমতল প্রায়; যার ফলে এখানে নদীর আঁকাবাঁকা গতি লক্ষণীয়।

এই সমগ্র মালভূমির চারটি ধাপে বিভিন্ন উচ্চতা লক্ষণীয়। একাধিক বার পুনরুত্থানের ফলে এইরকম বিভিন্ন উচ্চতার সৃষ্টি হয়েছে বলে অনুমান করা হয়। বিভিন্ন নদীর নানা জলপ্রপাত এই পুনরুত্থানের (Rejuvenation) প্রমাণ। মধ্য-পশ্চিম ভাগে সর্বোচ্চ অংশ প্রায় ১১০০ মি উঁচু। এই অংশকে 'প্যাট' (Pat) বলা হয়। এখান থেকে চতুর্দিকে মালভূমির উচ্চতা ধাপে ধাপে ক্রমনিম্ন।
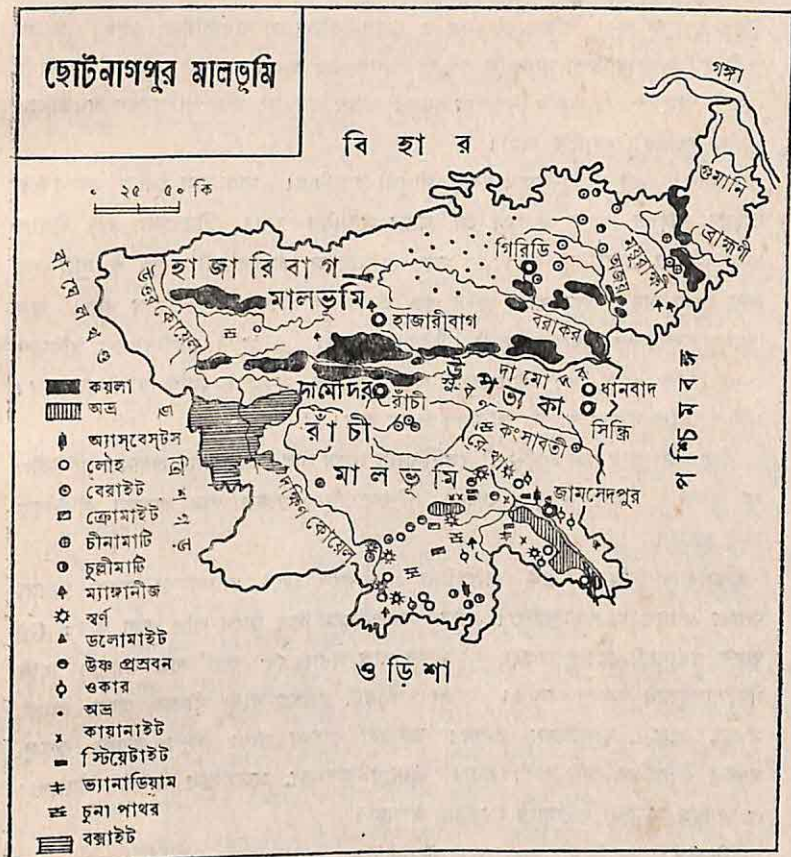
মানচিত্র ২২

হাজারীবাগ ও রাঁচী মালভূমির গড় উচ্চতা ৬০০ মি। মধ্যরাঁচী মালভূমির প্যাট অঞ্চল সমতলশীর্ষবিশিষ্ট ও ল্যাটারাইট আচ্ছাদিত। পূর্বে এই মালভূমি মানভূম সমপ্রায়ভূমির (Peneplain) ও দক্ষিণে চাইবাসার সমভূমির দিকে খাড়াভাবে নেমে গিয়েছে। মাঝখানে বাঘমুণ্ডির উচ্চভূমি (৬০০ মি) রাঁচী মালভূমি থেকে সুবর্ণরেখা নদীদ্বারা বিভক্ত। জামসেদপুর অঞ্চলে 'দলমা' পাহাড় মানভূম, সিংভূম ও ধলভূমের মধ্য দিয়ে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত। এই পাহাড় লাভা গঠিত। ছোটনাগপুর মালভূমির উত্তর-পূর্বে রাজমহল লাভা অঞ্চল বর্তমান। এই সমগ্র মালভূমির উত্তর-পূর্বে রাজমহল লাভা অঞ্চল বর্তমান। এই সমগ্র মালভূমির প্রধান প্রধান শিলা গ্রানাইট, নীস, বেলেপাথর, কাদাপাথর, স্লেট ইত্যাদি।

নানা নদীর স্রোতধারায় ছোটনাগপুর মালভূমি বিধৌত। এদের মধ্যে দামোদর,

বরাকর, সুবর্ণরেখা, দক্ষিণ কোয়েল ও উত্তর-কোয়েলের অববাহিকা বৃহৎ। কংসাবতী নদীর অববাহিকা মালভূমি অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। অজয়, ময়ূরাক্ষী, ব্রাহ্মণী, গুমানি রাজমহল উচ্চভূমি থেকে সমান্তরাল ভাবে প্রবাহিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গ সমভূমিতে প্রবেশ করেছে (মানচিত্র ২২)।

জলবায়ু : এই মালভূমির জলবায়ু মৌসুমী প্রভাবিত। মার্চ মাস থেকে এখানকার উষ্ণতা বাড়তে থাকে ও তা মে মাসে সর্বাধিক হয়। গ্রীষ্মকালে গড় উত্তাপ ৩২° সে বা ততোধিক হয়। এ সময় এ অঞ্চলে কালবৈশাখীর ঝড় ও ধূলি ঝড় হতে দেখা যায়। জুন মাসে বৃষ্টি শুরু হবার পর উষ্ণতা কিছুটা হ্রাস পায়। জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত মৌসুমী বৃষ্টিপাত কাল। এ সময় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১০০ থেকে ১৫০ সে। উচ্চ নেটারহাট অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয়। দক্ষিণ থেকে উত্তরে বৃষ্টির পরিমাণ ক্রমশ কম।

শীতকালে তাপমাত্রা ১৬°-১৭° সেন্টিগ্রেডে নেমে যায়। এই সময় প্রধানত বৃষ্টিহীন বা শুষ্ক । কিন্তু কখনও কখনও পশ্চিমাবায়ু প্রবাহের জন্য সামান্য বৃষ্টিপাত ঘটে থাকে।

স্বাভাবিক উদ্ভিদ : এই মালভূমির এক বৃহৎ অংশ অরণ্যমুক্ত হলেও অগম্য অঞ্চল এখনও অরণ্যাচ্ছাদিত। এইসব বনভূমিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় : (১) শুষ্ক পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য, (২) শুষ্ক শাল অরণ্য, (৩) আর্দ্র শাল অরণ্য। শাল ছোটনাগপুরের অমূল্য সম্পদ। শুষ্ক পর্ণমোচী বৃক্ষের মধ্যে সীমাল, জারা, খয়ের, মহুয়া, আসান, অমলতাস প্রধান। অন্যান্য বৃক্ষের মধ্যে কুসুম, অঞ্জন, করঞ্জু, গাম্বার ইত্যাদির নাম করা যায়। এছাড়া কুশঘাস, সাবইঘাস ও বাঁশ উল্লেখ্য। এ অঞ্চলে সামান্য পরিমাণে সেগুনও জন্মায়।

কৃষিকার্য : ছোটনাগপুরের প্রধান উপজীবিকা কৃষিকার্য এবং প্রায় ৮০ শতাংশ অধিবাসী এই কাজে লিপ্ত। মৌসুমী বৃষ্টির উপর এখানকার কৃষিকার্য একান্তভাবে নির্ভরশীল। উৎপন্ন শস্যের মধ্যে খারিফ শস্য, ভাদই ও রবি শস্যের চেয়ে ব্যাপক।

ধান এ অঞ্চলের সর্বপ্রধান ফসল। ধানের পরে ভুট্টা, রাগী, ছোলা ও নানাবিধ সবজির স্থান। উৎপন্ন ফসল প্রয়োজনের তুলনায় কম হওয়ায় এই অঞ্চলকে বাইরে থেকে শস্য আমদানী করতে হয়।

খনিজ সম্পদ ও শিল্প : সারা ভারতে ছোটনাগপুর খনিজ সম্পদে সবচেয়ে সমৃদ্ধ অঞ্চল। ভারতের ৮০ শতাংশ কয়লা সম্পদ ও প্রায় ১০০ শতাংশ কোক কয়লা এখানে অবস্থিত। এছাড়া প্রায় ১০০ শতাংশ তাম্র, ৯৫ শতাংশ কায়ানাইট, ৫০ শতাংশ অভ্র, বক্সাইট, চীনামাটি ও কয়লা এ অঞ্চলে উৎপাদিত হয়। এইসব সম্পদ কয়েকটি নির্দিষ্ট বলয়ে পাওয়া যায়।

কয়লা দামোদর উপত্যকায় গণ্ডোয়ানা শিলাস্তরে সঞ্চিত। এই স্তর হটার থেকে

ঝরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। এছাড়া ডালটনগঞ্জ ও গিরিডি অঞ্চলেও কিছু কয়লা পাওয়া যায়। এর বেশির ভাগ উৎকৃষ্ট বিটুমিনাস শ্রেণীর ও কোক কয়লার উপযুক্ত।

এখানকার দ্বিতীয় প্রধান সম্পদ লৌহ আকরিক সিংভূম জেলার ধারওয়ার স্তরে সঞ্চিত। এই আকরিক উৎকৃষ্ট হেমাটাইট শ্রেণীর।

চুনাপাথর পালামৌ, হাজারীবাগ, রাঁচী ও সিংভূম জেলায় বর্তমান। অভ্র কোদারমা মালভূমিতে ধারওয়ার স্তরে পাওয়া যায়। এই অভ্র উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ও তা দেশে ও বিদেশে আদরণীয়। তাম্র সিংভূম জেলার অনেকটা স্থান জুড়ে বর্তমান। প্যাট অঞ্চলে প্রধানত বক্সাইট পাওয়া যায়। অন্যান্য খনিজ সম্পদের মধ্যে অ্যাস্‌বেস্‌টস্‌, ক্রোমাইট, কায়ানাইট, অ্যাপাটাইট, স্টিয়েটাইট, স্বর্ণ ও ইউরেনিয়ম উল্লেখযোগ্য।

খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ ছোটনাগপুর অঞ্চল আশানুরূপ শিল্প সমৃদ্ধ নয়। কয়লা, লৌহ, চুনাপাথর ইত্যাদির সান্নিধ্যে জামসেদপুরে সুবৃহৎ লৌহ-ইস্পাত শিল্প গড়ে উঠেছে। রাঁচীতে ভারী ধাতুশিল্প, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ও অন্যান্য নানা লৌহ-ইস্পাত দ্রব্য শিল্প অধুনাকালে গড়ে উঠেছে। এছাড়া রাঁচী অঞ্চলে কার্পাস শিল্প, মদ্যশিল্প ও চীনামাটি শিল্পও বর্তমান। ধানবাদের সিন্‌দ্রি রাসায়নিক শিল্প, সারশিল্প ও সিমেন্ট শিল্পের জন্য উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য শিল্পের মধ্যে বিভিন্ন স্থানের কাচশিল্প, চুল্লীমাটীর ইট শিল্প, অ্যালুমিনিয়ম শিল্প ও নানা খাদ্য শিল্পের নাম করা যায়।

খনিজসম্পদ উত্তোলন এ অঞ্চলে একটি প্রধান শিল্প।

যোগাযোগ ব্যবস্থা : উনবিংশ শতাব্দীতে এ অঞ্চলে প্রথম পূর্ব রেল ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের পত্তন হয়। তারপর শিল্প বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে প্রধান রেলপথের শাখা বিস্তার ঘটে। রেলপথে প্রধানত ভারী খনিজ সম্পদ ও শিল্পসম্ভার বাহিত হয়। প্রয়োজন অনুসারে রেলপথের আরও উন্নতি হওয়া বাঞ্চনীয়।

সড়কপথের মধ্যে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ও পাটনা-রাঁচী রোডের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ্য। এছাড়া বিভিন্ন শহর ও নগর সড়কপথে সংযুক্ত। ধানবাদ জেলার সড়কপথে সর্বাপেক্ষা অধিক যাত্রীবাহী যান চলাচল করে।

বসতি, শহর ও নগর : ছোটনাগপুরের গ্রাম বসতি সাধারণত বিক্ষিপ্ত। কিন্তু দামোদর উপত্যকা, ধানবাদ ও চাইবাসার সমপ্রায় অঞ্চলে সন্নিবিষ্ট বসতি দেখা যায়। প্রায় প্রতি বসতিগৃহে একটি মূলকক্ষকে কেন্দ্র করে অন্যান্য কক্ষ গড়ে ওঠে। এইসব গৃহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে মৃত্তিকা, বেড়া, শণ ও খোলা দ্বারা নির্মিত।

জামসেদপুর (জনসংখ্যা ৩৫৬,৭৮৩): ছোটনাগপুরের বৃহত্তম ও বিহারের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগর। ইস্পাতনগরীরূপে সুবর্ণরেখা, সঞ্জয় ও খরকাই-এর তীরে ১৯০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই নগরীর ৭০ শতাংশ অধিবাসী শ্রমশিল্পে নিযুক্ত। আধুনিক পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্মিত জামসেদপুরের রাস্তাঘাট ও আবাসিক অঞ্চল আকর্ষণীয়।
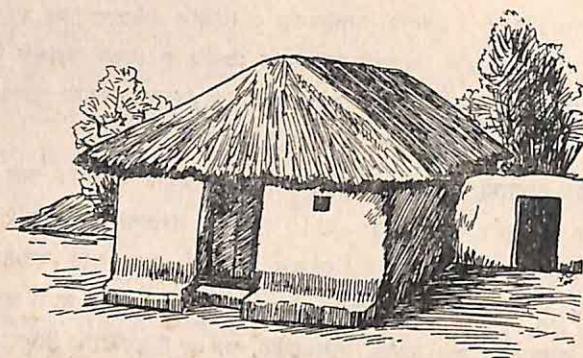
রাঁচী মালভূমির মাটির কুটির

রাঁচী মালভূমির খোলা ও বেড়ার কুটির
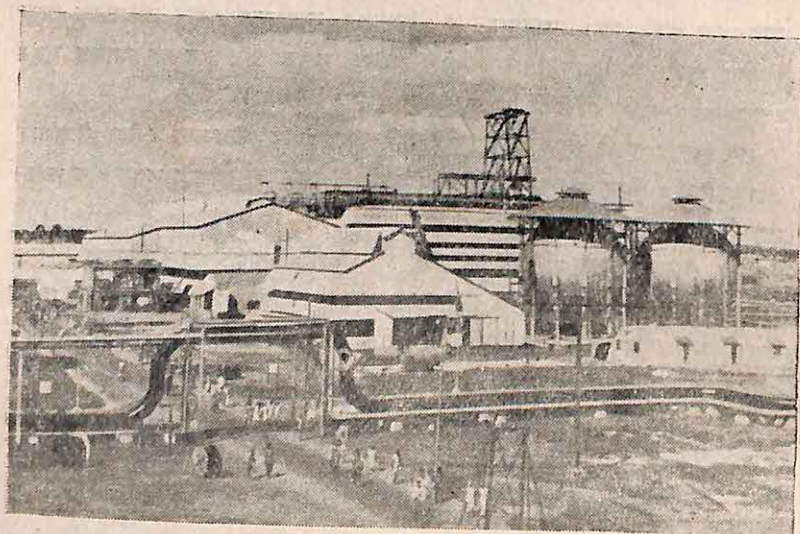
সিন্ধ্রির সার কারখানা

রাঁচী (জনসংখ্যা ১৭৫,৯৩৪) : ছোটনাগপুরের দ্বিতীয় নগর। এই নগর বিশিষ্ট প্রশাসনিক, শিক্ষা ও শিল্পকেন্দ্র। সড়কপথে এই নগর অন্যান্য শহরের সঙ্গে যুক্ত।

ধানবাদ : ঝরিয়া কয়লা অঞ্চলে ধানবাদ (জনসংখ্যা ৭৯,৮৩৮) একটি বড় শহর। এই শহর প্রসাসনিক কেন্দ্র ও শ্রমশিল্প কেন্দ্র রূপে প্রাধান্য লাভ করেছে। কয়লা উত্তোলন শ্রমশিল্পের সঙ্গে এই শহরের শ্রীবৃদ্ধি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

অন্যান্য শহরের মধ্যে সিন্‌ধ্রি শিল্পকেন্দ্র, হাজারিবাগ ও গিরিডি শিল্প ও বাণিজ্যকেন্দ্র, ডালটনগঞ্জ, চাইবাসা, কুমারডুবি, লোহারদাগা, নোয়ামুণ্ডি, গোমো, লিনদেগা, গুয়া, ঘাটশীলা, মুরী, নেটারহাট ইত্যাদি শিল্প, বাণিজ্য ও স্বাস্থ্যকেন্দ্ররূপে গড়ে উঠেছে।

অষ্টম অধ্যায়

কচ্ছ ও কাথিয়াবাড়

কচ্ছ ও কাথিয়াবাড় উপদ্বীপ

অবস্থান : ভারতের পশ্চিম প্রান্তে আরব সাগরের উত্তর কূলে কচ্ছ ও কাথিয়াবাড় উপদ্বীপ। এই অঞ্চল গুজরাট রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ও কচ্ছ রাণ থেকে ক্যাম্বে উপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। কচ্ছ ও কাথিয়াবাড়ের আয়তন ১১৯,০০০ ব কি। এর উত্তরে পাকিস্তান, দক্ষিণে আরব সাগর ও উত্তর-পূর্ব ও পূর্বে গুজরাট রাজ্য (মানচিত্র ২৩)। এর ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করার মত।

মানচিত্র ২৩
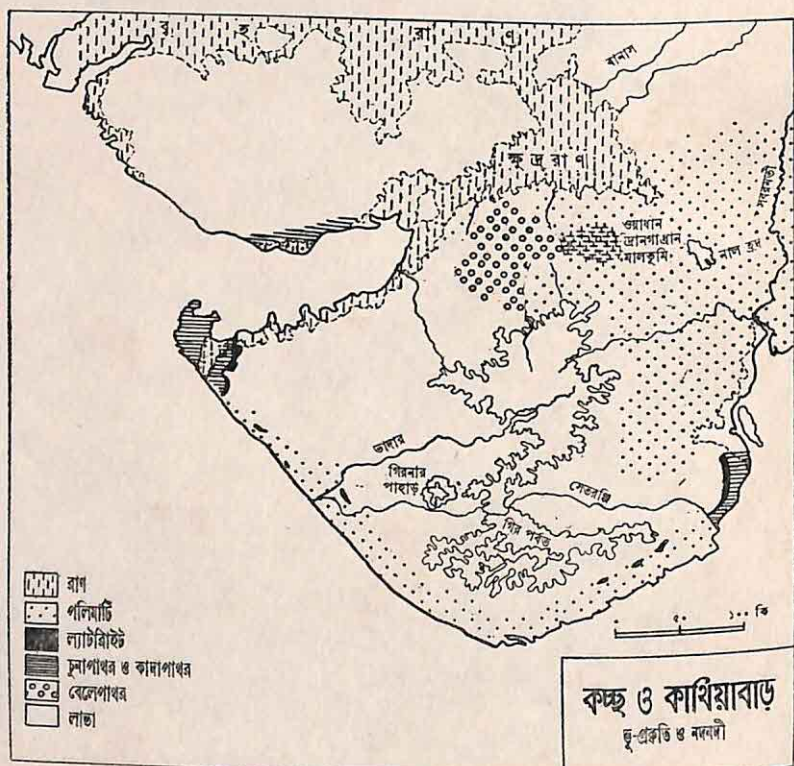
ভূপ্রকৃতি ও নদনদী : কচ্ছ ও কাথিয়াবাড়ের প্রাকৃতিক স্বকীয়তা ভারতে অদ্বিতীয়। রাণ অঞ্চল কর্দমাক্ত নগ্ন প্লাবন সমভূমি। এই কর্দমাক্ত প্লাবনভূমি কৃষ্ণবর্ণ ও তা স্থানে স্থানে লবণের সরে আচ্ছাদিত। উত্তরে কচ্ছ অঞ্চল মরু অঞ্চলের সঙ্গে প্রায় অস্পষ্টভাবে বিলীন হয়ে গেছে। ১৮১৯ সালে ভূমিকম্পের সময় সিন্ধুনদের শাখানদীগুলি দিক পরিবর্তন করে কচ্ছ রাণ অঞ্চলে প্রবাহিত হয়।

সমুদ্রবেষ্টনী ও জলাভূমির পটভূমিতে কচ্ছ ও কাথিয়াবাড়ের ভূপ্রকৃতি সরল প্রকৃতির। অনুমান করা হয় অতীত কালে এই উপসাগরীয় অঞ্চল সিন্ধুর সঞ্চয়জাত অঞ্চলের অংশ ছিল ও কাথিয়াবাড় একটি দ্বীপ ছিল। ক্রমাগত পলিসঞ্চয় ও ভূ-উন্নতির ফলে মূল ভূভাগের সঙ্গে এই অঞ্চল যুক্ত হয়ে যায়। কচ্ছের পূর্বে ক্ষুদ্র রাণ, হ্রদ ও জলাভূমিতে সমাকীর্ণ। এই হ্রদ ও জলাভূমি পূর্ব স্রোতধারার ইঙ্গিতবাহী। উত্তরে রাণ অঞ্চলের পাচান দ্বীপ কচ্ছের সর্বোচ্চ স্থান। এর উচ্চতা ৩৩৫ মি। কচ্ছ অঞ্চল লাভা, বেলেপাথর, পলি ও বালি দ্বারা গঠিত (মানচিত্র ২৩)।

কাথিয়াবাড় উপদ্বীপের মধ্যভাগ লাভাগঠিত মালভূমি। এই মালভূমি অসংখ্য লাভা বাঁধ বা প্রাচীরে সমাচ্ছন্ন। লাভা অঞ্চলের দক্ষিণ সীমা ল্যাটেরাইট চিহ্নিত। এই মালভূমির উত্তর-পূর্ব ভাগ বেলেপাথর, পশ্চিম ভাগ চুনাপাথর ও কাদাপাথর এবং দক্ষিণ, পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম ভাগ পলিমাটি ও সূক্ষ্ম বালিতে গঠিত। কাথিয়াবাড়ের অধিকাংশ স্থান ১৮৫ মিটারের নিম্নে। কাথিয়াবাড়ের পূর্বে অবনত অংশে নাল হ্রদ অবস্থিত। এখানকার পাহাড় অঞ্চলের মধ্যে রাজকোটের পূর্বে পাহাড়ের উচ্চতা ৩৩৫ মি ও দক্ষিণে গির পাহাড়ের উচ্চতা ৬৪০ মি, আরও পশ্চিমে গিরনার পাহাড় অঞ্চলের উচ্চতা ১১১৭ মি এবং এই উচ্চতাই কাথিয়াবাড়ে এই উচ্চ ভূভাগ অরীয় (Radial) নদীপ্রবাহের সৃষ্টি করেছে। এদের মধ্যে পশ্চিমবাহিনী নদী ভাদার ও পূর্ব বাহিনী সেতরঞ্জি প্রধান।

জলবায়ু : রাজস্থানের প্রতিবেশী অঞ্চল হিসেবে কচ্ছ ও কাথিয়াবাড় উপদ্বীপের জলবায়ুও শুষ্ক। তবে মৌসুমী বায়ুর গতিপথে অবস্থিত হওয়ায় এই শুষ্ক অবস্থার তারতম্যও লক্ষ্য করা যায়। এই অঞ্চল প্রধানত উষ্ণ। গ্রীষ্মকালীন উত্তাপ ২৭°–৩৫° সে ও শীতকালীন উত্তাপ ২৬°–৩০° সে। কিন্তু গ্রীষ্মে সর্বোচ্চ উত্তাপ সময় সময় ৪৩·৩° সে পর্যন্ত হতে দেখা যায়।

কচ্ছ অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৪০ সে মি। কাথিয়াবাড়ের উপকূল অঞ্চলে ৫০ সে ও ক্যাম্বে উপকূলে ৫৫–৬০ সে পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়। গিরনার পাহাড়ের পশ্চিমে ৮০ সে পর্যন্ত বৃষ্টিপাত ঘটে। মোটামুটিভাবে কচ্ছ ও কাথিয়াবাড়ের বৃষ্টিপাতচক্র খুব অনিশ্চিত।

স্বাভাবিক উদ্ভিদ : শুষ্ক পরিবেশে এ অঞ্চলের উদ্ভিদ কাঁটা-ঝোপ পর্যায়ের। এখানকার গাছগুলি আকারে হ্রস্ব। কাঁটা ঝোপ ক্রমে উত্তরে নিকৃষ্ট ঘাস ও গুল্মে

পরিণত হয়েছে। গির ও গিরনার পাহাড় অঞ্চলে শুষ্ক পাতাঝরা বৃক্ষ দৃষ্টিগোচর হয়। এই গির অরণ্যেই ভারতের বিখ্যাত 'গির' সিংহ পাওয়া যায়। রাণ অঞ্চল প্রায় বন্ধ্যা। স্যাঁতসেঁতে অঞ্চলে জলা উদ্ভিদের সন্ধান মেলে।

কৃষিকার্য: কচ্ছের প্রায় ৭৭ শতাংশ ভূমি বন্ধ্যা ও কৃষিকার্যের অনুপযুক্ত। অবশিষ্ট ২০ শতাংশ ভূভাগ কৃষিভূমি ও ২ শতাংশ চারণভূমি রূপে ব্যবহৃত। এখানকার সর্বপ্রধান ফসল বাজরা। অপরাপর ফসলের মধ্যে তৈলবীজ, জোয়ার, তুলো, চীনাবাদাম ও গমের নাম করা যায়।

কাথিয়াবাড়ের ৬৩ শতাংশ ভূমি কৃষিযোগ্য। পলিগঠিত অঞ্চল, নদী অববাহিকা ও নদী বিভাজিকা (Interflunes) অনুকূল কৃষিভূমি। শুষ্ক আবহাওয়ার জন্য এখানে যথেষ্ট জলসেচের প্রয়োজন। জলাশয় ও কূপের সাহায্যে প্রাচীন পদ্ধতিতে জলসেচ করা হয়। আধুনিক সেচ পরিকল্পনার মধ্যে বিভিন্ন নদী-প্রকল্পের খালসেচ উল্লেখের দাবী রাখে। এদের মধ্যে নর্মদা প্রকল্প দ্বারা কচ্ছ ও কাথিয়াবাড়ের বেশ কিছু অংশ উপকৃত হবে। চীনাবাদাম এখানকার সর্বপ্রধান ফসল। এর পরই জোয়ারের স্থান। অন্যান্য প্রধান ফসল তুলো, বাজরা, তৈলবীজ, গম ও ধান।

খনিজ সম্পদ ও শিল্প: কচ্ছের উল্লেখযোগ্য খনিজ সম্পদ লিগনাইট, চুনাপাথর, বক্সাইট ও লবণ। কাথিয়াবাড়ে চুনাপাথর, লবণ, বক্সাইট, চুল্লীমাটি, ক্যালসাইট ইত্যাদি খনিজ সম্পদ প্রধান। এই সম্পদের মধ্যে লিগনাইট, বক্সাইট, চুনাপাথর ও লবণের অর্থনৈতিক গুরুত্ব যথেষ্ট।

ভারতে এই অঞ্চল শিল্পোন্নত অঞ্চলগুলির অন্যতম। পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র ও পূর্ব গুজরাটের পরই এর স্থান। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে এ অঞ্চল ভারতের উৎকৃষ্ট কয়লা অঞ্চল থেকে বহু দূরে অবস্থিত। ১৯৫০ সালের আগে এখানে যথেষ্ট শক্তি উৎপাদন হত না। কিন্তু বর্তমানে তাপ বিদ্যুৎশক্তি ও ডিজেলশক্তি পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হওয়ায় শিল্প প্রগতির সহায়ক হয়েছে। ভবিষ্যতে বিভিন্ন নদী-প্রকল্প থেকে জলবিদ্যুৎ শক্তি ও তারাপুরের পরমাণবিক শক্তি শিল্পসমূহকে আরও সাহায্য করবে।

যোগাযোগ ব্যবস্থা: কচ্ছের যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসার ভূপ্রকৃতির জন্য অনেকটা ব্যাহত। এখানে মীটারগজ রেলপথ ভুজ পর্যন্ত বিস্তৃত। এছাড়া টুনা ও কান্দলা বন্দরও রেলপথে সংযুক্ত। সড়কপথ অবশ্য আরও পশ্চিমে লাখপাত, দক্ষিণে মান্দাভি ও উত্তরে খাভদা পর্যন্ত চলে গেছে। কিন্তু আরও উত্তরে রাণ ও সন্নিহিত অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই বললেই চলে।

কাথিয়াবাড়ে রেলপথ ও সড়কপথের বিস্তৃতি সন্তোষজনক। উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ উপকূলের জামনগর, ওখা, পোরবন্দর, ভেরাডল, কোদিনার, উনা প্রভৃতি

মানচিত্র ২৪

স্থান রেলপথ ও সড়কপথে যুক্ত। এই অঞ্চলের রাজকোট, সুরেন্দ্রনগর ও আমরেলি উল্লেখযোগ্য রেল ও সড়কপথের মিলনকেন্দ্র।

বসতি, শহর ও নগর: এই অঞ্চলের অপেক্ষাকৃত প্রাচীন গ্রামগুলি প্রাচীরবেষ্টিত। অধুনা স্থাপিত বসতি অঞ্চলে অবশ্য প্রাচীর বা দেওয়ালের সন্ধান মেলে না। বসতি-গৃহ গোলাকার ও আয়তাকার। এবং গৃহ নির্মাণ সামগ্রী মৃত্তিকা, নল, শণ, খড়, ইট, টালি, টিন ইত্যাদি।

ভুজ (জনসংখ্যা : ৫২,৮৬১): কচ্ছের জেলাসদর। রেলপথ ও সড়কপথের সন্ধি-স্থলে এই শহর একটি উল্লেখযোগ্য সামরিক কেন্দ্র। বাণিজ্য ক্ষেত্রেও ভুজের প্রাধান্য যথেষ্ট! **খান্দভি** (জনসংখ্যা : ২৭,৮৪৯) ও **অঞ্জুর** (জনসংখ্যা : ২৭,৩০২), অন্যান্য শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র। **গান্ধীধাম** অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক কেন্দ্র। স্বাধী-নোত্তর যুগে ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত **কান্দলা** শহর বর্তমানে ভারতে একটি বিশিষ্ট বন্দর। কচ্ছ উপসাগরকূলে এই বন্দরের জলের গভীরতা ৯ মিটার ও জেটির দৈর্ঘ্য ৮২০ মি। এই কারণে কান্দলা একটি উৎকৃষ্ট বন্দররূপে স্বীকৃত। এই বন্দরের

পশ্চাৎ প্রদেশ বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ও রেলপথে কান্দলা আমেদাবাদ দিল্লী প্রভৃতি নগরের সঙ্গে যুক্ত।
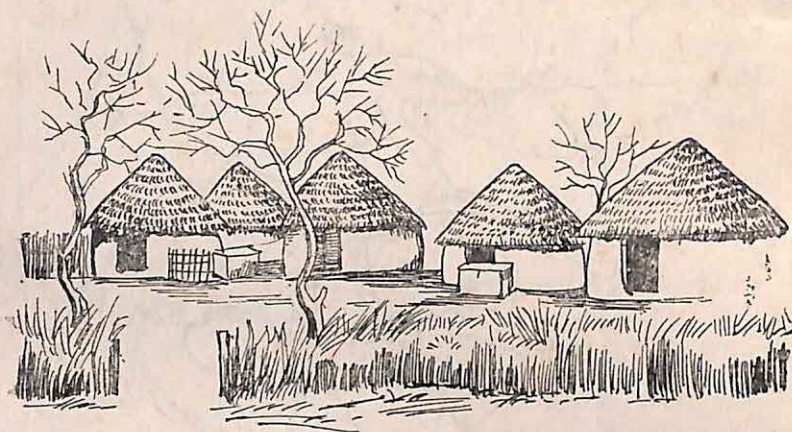
কচ্ছের গ্রাম

কাথিয়াবাড়ের বৃহত্তম শহর **রাজকোট** (জনসংখ্যা : ৩০০,৬১২) একটি জেলাসদর। এখানকার বয়নশিল্প, ধাতব, আসবাব ও রাসায়নিক শিল্প উল্লেখযোগ্য। জেলাসদর **ভাবনগর** (জনসংখ্যা : ২২৫,৯৭৪) একটি বন্দর ও রেল কেন্দ্র। এখানকার প্রধান প্রধান শিল্প কার্পাস, রেশম, কাগজ, লৌহ-ধাতব সরঞ্জাম ও রাসায়নিক। **জামনগর** (জনসংখ্যা : ২১৪,৮১৬) অপর একটি জেলাসদর। এই শহর স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ সামরিক কেন্দ্র। রেলপথ ও সড়কপথ কেন্দ্রে এখানে নানা শিল্প গড়ে উঠেছে। যেমন পশম, রেশম, লৌহ-ধাতব ও রাসায়নিক শিল্প। **জুনাগড়** শহরও (জনসংখ্যা : ৯৫,৯০০) একটি জেলাসদর। এখানকার উল্লেখযোগ্য শিল্প কার্পাস ও লৌহ-ইস্পাত আসবাব।

কাথিয়াবাড়ের উল্লেখযোগ্য বন্দর **পোরবন্দর, ভেরাডল, ওখা, দ্বারকা, বেদী** ও **পাটন**। পোরবন্দরে সিমেন্ট শিল্প গড়ে উঠেছে। ওখা একটি সম্পূর্ণ আধুনিক বন্দর। এখানকার সিমেন্ট রপ্তানি প্রধান ।

নবম অধ্যায়

পূর্ব উপকূলীয় সমভূমি

উত্তরে পশ্চিমবঙ্গের সীমানা থেকে দক্ষিণে তামিলনাড়ুর প্রান্তভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত ভারতের পূর্ব উপকূল জুড়ে প্রায় ১৬০০ কি দীর্ঘ একটি অপ্রশস্ত সমভূমির সৃষ্টি হয়েছে। এই সমভূমির আয়তন প্রায় ১০২,৮৮২ ব কি।

অবস্থান: ওড়িশা, অন্ধ্র এবং তামিলনাড়ুর উপকূলভাগকে নিয়ে এই সমভূমি গঠিত। উত্তরদিকে এই সমভূমি ধীরে ধীরে পশ্চিমবঙ্গের উপকূলীয় সমভূমির সঙ্গে মিশে গেছে। উপকূলের ওড়িশা ও অন্ধ্রের অন্তর্গত অংশের নাম 'সিরকাস' ও তামিল-নাড়ুর অন্তর্গত অংশ 'করমণ্ডল' নামে পরিচিত। পশ্চিম দিকে ক্ষয়প্রাপ্ত পূর্বঘাট পর্বতের বিচ্ছিন্ন শাখা সমভূমির ভূপ্রাকৃতিক সীমানা নির্দেশ করছে (মানচিত্র ২৫)। ওড়িশায় সাধারণভাবে ৭৫ মি, অন্ধ্রতে ১০০ মি এবং তামিলনাড়ুতে ১৫০ মি সমোন্নতি রেখা থেকে সমভূমির শুরু হয়েছে।

ভূপ্রকৃতি ও নদনদী: উত্তর থেকে দক্ষিণে অবিচ্ছিন্নভাবে বিস্তৃত এই সমভূমি সর্বত্র সমান প্রশস্ত নয়। কোথাও তা ১৫০ কিলোমিটারের ওপর, আবার কোথাও বা ৪০ কিলোমিটারের কম। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে পূর্বঘাট পর্বত এবং সন্নিহিত মালভূমি অঞ্চলের ক্ষয়িত পদার্থ জমা হয়ে এই সমভূমির সৃষ্টি হয়েছে। পশ্চিম থেকে প্রবাহিত মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরী নদীর বদ্বীপাঞ্চলে সমভূমির প্রস্থ সর্বাপেক্ষা অধিক। ঐ সব প্রধান নদী ছাড়াও অন্যান্য অজস্র নদী একই ভাবে এই সমভূমি গঠনে সহায়তা করেছে। এছাড়া একমাত্র দক্ষিণের কিছু অংশ ছাড়া উপকূলভাগ উত্থানশীল (Emergent) পর্যায়ের। অর্থাৎ উপকূল ধীরে ধীরে সমুদ্রজল থেকে উঠে স্থলভাগের সৃষ্টি করেছে। দক্ষিণাংশে উপকূল কোথাও কোথাও নিমজ্জনশীল (Submerged) পর্যায়ের। অর্থাৎ সমুদ্র স্থলভাগকে গ্রাস করেছে। তটভাগের প্রথম ১০ কি অংশ পর্যন্ত বালিয়াড়ির সারি দেখা যায়। বালিয়াড়িগুলি ১-৪ কি দীর্ঘ এবং উচ্চতায় ওড়িশা উপকূলে ৫ মি থেকে আরম্ভ করে তামিলনাড়ু উপকূলে ৬৫ মি পর্যন্ত হতে দেখা যায়। বালিয়াড়ির সারি বরাবর সমগ্র তটভাগ জুড়ে অসংখ্য উপহ্রদের সৃষ্টি হয়েছে। এদের মধ্যে ওড়িশার অন্তর্গত চিল্কা এবং অন্ধ্রপ্রদেশের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত পুলিকাট হ্রদ আয়তনে বৃহত্তম। সমুদ্রের জোয়ারের জল প্রবেশ করে বলে হ্রদ দুটির জল লবণাক্ত। সমভূমি ধীরে ধীরে পূর্বদিকে ঢালু

মানচিত্র ২৫

হয়ে গেছে। দীর্ঘ সমভূমির বৈচিত্র্যহীন সমতলতা কোথাও কোথাও পূর্বঘাট পর্বতের বিচ্ছিন্ন কোন শাখার আবির্ভাবে ব্যাহত হয়েছে। তামিলনাড়ুর আদিয়ার এবং পালার নদীর মধ্যবর্তী অংশে পূর্বঘাটের বিচ্ছিন্ন শাখা তিনটি ছোট পাহাড় শ্রেণীর সৃষ্টি করেছে। চারপাশে সমভূমির বেষ্টনের মধ্যে সমোচ্চশীর্ষ এবং অত্যন্ত খাড়া-ঢালবিশিষ্ট এই পাহাড়গুলিকে ক্ষয়াবশিষ্ট পাহাড় (Inselberg) বলা হয়।

সমভূমি অঞ্চলে প্রবাহিত নদীগুলির অধিকাংশ পশ্চিমঘাট পর্বত থেকে উৎপন্ন।

বৃষ্টিজলপুষ্ট নদীগুলি বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য সময়ে প্রায় শুকিয়ে আসে এবং তার ফলে নাব্যতা হ্রাস পায়। দীর্ঘকালব্যাপী ক্ষয়ের ফলে মালভূমির উৎস থেকে উপকূল পর্যন্ত দীর্ঘ প্রবাহপথে নদীখাত প্রায় সম ঢালে উপনীত হয়েছে। এই কারণে সমভূমি অঞ্চলে প্রবেশ করার পর নিজের সঞ্চিত পদার্থে বাধা পেয়ে নদী কয়েকটি ধারায় বিভক্ত হয়ে বিশাল বদ্বীপের জন্ম দিয়েছে। উত্তরাংশে মহানদী তার দুই প্রধান উপনদী ব্রাহ্মণী ও বৈতরণীর সম্মিলিত জলধারা নিয়ে প্রবাহিত হবার পথে কোন কোন বর্ষাকালে বিধ্বংসী বন্যার সৃষ্টি করে। হিরাকুদ বাঁধ নির্মাণের পর বন্যার প্রকোপ অনেক স্তিমিত হয়েছে। মহানদীর দক্ষিণে গোদাবরী দক্ষিণ ভারতের সর্ববৃহৎ নদী। স্থানে স্থানে নদীটি প্রায় ৬ কি প্রশস্ত। মহানদী এবং গোদাবরী সাগরে পতিত হবার আগে বদ্বীপের সৃষ্টি করেছে। আরও দক্ষিণে যথাক্রমে কৃষ্ণা এবং কাবেরী বিভিন্ন উপনদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে পূর্বাভিমুখে প্রবাহিত অবস্থায় বিশাল বদ্বীপ গঠন করেছে।

এই চারটি প্রধান নদী ছাড়া উপকূলভাগের অন্যান্য নদীর মধ্যে পন্নায়ার, পালার, ভায়গায়, ভেল্লার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য (মানচিত্র ২৫)।

জলবায়ু: উপকূলীয় সমভূমি উষ্ণ ক্রান্তীয় জলবায়ুর অন্তর্গত। এখানে গ্রীষ্মকাল উষ্ণ এবং আর্দ্র হওয়াতে অত্যন্ত কষ্টকর। ফেব্রুয়ারি থেকে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং মে মাস নাগাদ তাপাঙ্ক পুরীতে ৩১° সে, মসলীপটম ও মাদ্রাজে ৩৫° সে এবং অভ্যন্তরভাগে ৩৭°-৪০° সেন্টিগ্রেডে পৌঁছে যায়। বলা বাহুল্য, সমুদ্র-সান্নিধ্যের জন্য উপকূলভাগের আবহাওয়া অভ্যন্তরভাগ অপেক্ষা কম উষ্ণ। একই কারণে শীতের মাত্রাও উপকূলভাগে কম। জানুয়ারি মাসে উপকূলভাগের উত্তাপ ২২° সে, কিন্তু অভ্যন্তরভাগে তা ১৯°-২০° সে। সমুদ্রের প্রভাবে দিন এবং রাতের তাপমাত্রার মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য দেখা যায় না। বৃষ্টির পরিমাণও উপকূলভাগে বেশি। (১৪০-১৭০ সেমি); পশ্চিম দিকে পূর্বঘাটের কাছে তা কমে এসেছে (৭০-৮০ সেমি)। কিন্তু উত্তর থেকে দক্ষিণে বৃষ্টিপাতের তারতম্য দেখা যায়। ওড়িশা উপকূলে বালাসোরে বৃষ্টির পরিমাণ সর্বাধিক (১৬৯ সেমি); দক্ষিণে গোদাবরী-কৃষ্ণার বদ্বীপাঞ্চল পর্যন্ত তা ধীরে ধীরে কমে কাকিনাড়ায় ১১৮ সেন্টিমিটারে এসে দাঁড়িয়েছে। এর পর দক্ষিণে কাবেরী বদ্বীপাঞ্চল পর্যন্ত বৃষ্টির পরিমাণ আবার ধীরে ধীরে বেড়ে গেছে (নাগাপট্টনম: ১৩৭ সেমি)। আরও দক্ষিণে বৃষ্টি আবার কমতে কমতে টিউটিকোরীনে ৬০ সেন্টিমিটারে নেমে এসেছে। গোদাবরী-কৃষ্ণার দক্ষিণে বৃষ্টি কমার একমাত্র কারণ এখানে উপকূলভাগ দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর মূল প্রবাহ-পথের বাইরে অবস্থিত। এর দক্ষিণে বৃষ্টি বেড়ে যাবার জন্য দায়ী অপসৃয়মান মৌসুমী বায়ু। বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলকণা আহরণ করে ঐ বায়ু বছরের প্রায় অর্ধেক বৃষ্টিপাত ঘটিয়ে থাকে। এই বর্ষণ প্রধানত প্রবল ঝড়ের আকারে হয়।

এপ্রিল এবং অক্টোবর মাসে উপকলীয় সমভূমিতে পর পর অনেক ঘূর্ণিঝড় জীবন এবং সম্পত্তির প্রচুর ক্ষতি করে।

স্বাভাবিক উদ্ভিদ : কয়েক হাজার বছর ধরে মনুষ্য বসবাস ও দীর্ঘকাল অবিরাম কৃষিকার্য সমভূমি অঞ্চলকে প্রায় অরণ্যমুক্ত করে তুলেছে। সমগ্র সমভূমি অঞ্চল কৃষির আওতায় এসে যাওয়াতে একমাত্র জলাভূমি ও বালিয়াড়িতে কিছু স্বাভাবিক জলজ এবং গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ দেখা যায়। ওড়িশা ও অন্ধ্রের কোন কোন স্থানে কিছু আর্দ্র পর্ণমোচী অরণ্য এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে। তামিলনাড়ুতে তাও নেই। সমভূমির অভ্যন্তরভাগে বৃষ্টিপাতের ঘাটতি থাকায় স্থানে স্থানে কাঁটাঝোপ ও বাবুলজাতীয় বৃক্ষ জন্মায়।

কৃষিকার্য : ভূমির উর্বরতা, অজস্র নদী ও তাদের শাখাপ্রশাখা থেকে জলের অঢেল সরবরাহ এবং অনুকূল জলবায়ুর ওপর নির্ভর করে প্রাচীনকাল থেকে এখানকার কৃষিব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এখানকার মৃত্তিকা প্রধানত পললজাতীয় এবং খুবই উর্বর। তামিলনাড়ু ও অন্ধ্র প্রদেশের কিছু অংশে রক্ত মৃত্তিকা দেখা যায়। নদী উপত্যকার নিম্নবর্তী স্থানে ওড়িশা থেকে তামিলনাড়ু পর্যন্ত বিস্তৃত সমভূমির স্থানে স্থানে কৃষ্ণমৃত্তিকা বা 'রেগুর' নামক অত্যন্ত উর্বর মৃত্তিকার সন্ধান মেলে। এছাড়া কোন কোন স্থানে ল্যাটেরাইট মৃত্তিকাও আছে।

কৃষিকার্য অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা। কৃষিকার্যকে উপলক্ষ করে এখানে জলসেচের বিরাট ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। নিম্নবর্তী স্থানে খাল ও কৃত্রিম জলাধার এবং অপেক্ষাকৃত উচ্চস্থানে ইঁদারা বা কূপ থেকে জলসেচ করা হয়ে থাকে। প্রধানত বদ্বীপাঞ্চলে খাল-সেচ প্রাধান্য লাভ করেছে। ওড়িশা উপকূলে প্রায় ১০ লক্ষ হেক্টর জমিতে সাতটি সেচ-খাল ব্যবস্থার সাহায্যে জল সরবরাহ করা হয়। এদের মধ্যে মহানদী সেচ ব্যবস্থা, মালান্দি সেচ ব্যবস্থা, বৈতরণী সেচ ব্যবস্থা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। অন্ধ্র উপকূলের প্রায় ৭৫ শতাংশ কৃষিভূমি সেচখালের দ্বারা সিঞ্চিত হয়ে থাকে। তার মধ্যে গোদাবরী সেচখাল ৪০০,০০০ হেক্টর এবং কৃষ্ণার সেচখাল ৩৫০,০০০ হেক্টর জমিতে জলসেচ করে। এছাড়া পেন্নের নদীর সেচখাল আরও ৬৮০০০ হেক্টর জমিতে জল জুগিয়ে থাকে। তামিলনাড়ু রাজ্যে কাবেরী বদ্বীপে এই অঞ্চলের সর্ববৃহৎ সেচখাল ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এখানে ১২ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচের সুযোগ আছে। পালার, চেইয়ার, পন্নাইয়ার প্রভৃতি নদী থেকেও খাল কেটে জলসেচের ব্যবস্থা রয়েছে।

অন্ধ্র প্রদেশের শ্রীকাকুলাম জেলা এবং তামিলনাড়ুর দক্ষিণভাগে চিঙ্গালপুট, মাদুরা, তিরুনেলভেলী ও রামনাথপুরম জেলায় প্রধানত কৃত্রিম জলাধার থেকে জলসেচ করা হয়। সাধারণত দুরকম কৃত্রিম জলাধার হয়ে থাকে। নদীর ওপর আড়াআড়ি বাঁধ দিয়ে খালের সাহায্যে জল নিয়ে অন্যত্র জলাধারে জল জমা করা হয়। আবার

কোথাও কোথাও ছোট ছোট নদীর ওপর ঢালু জায়গা দেখে আড়াআড়ি মাটির বাঁধ দিয়ে জল আটকে রেখে জলাধার সৃষ্টি করা হয়। একমাত্র তামিলনাড়ুতেই প্রায় ১০ লক্ষ হেক্টর জমিতে এই ধরনের কৃত্রিম জলাধার থেকে জলসেচ প্রচলিত।
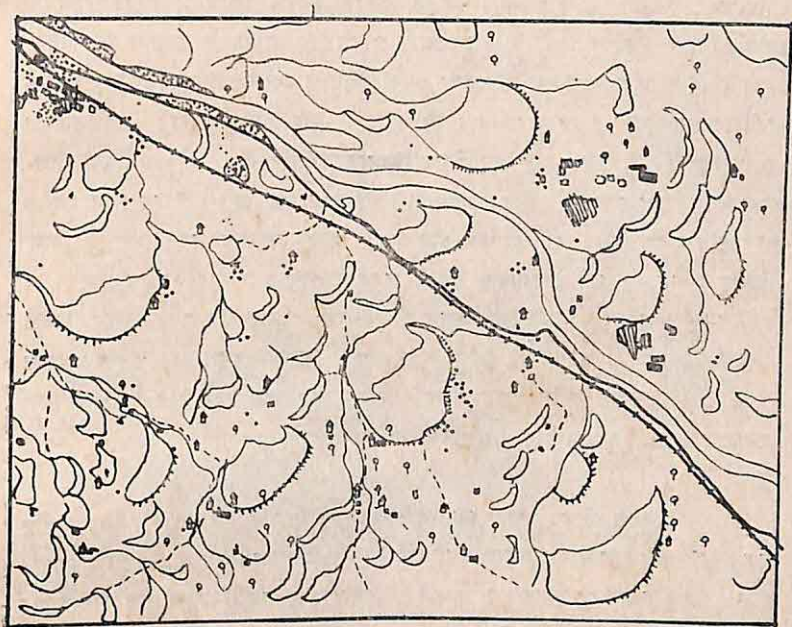
মাদুরা অঞ্চলে জলসেচে কৃত্রিম জলাধার

তামিলনাড়ুর প্রায় সর্বত্র জলসেচের জন্য জমির মাঝখানে ইঁদারা বা কূপ খনন করা হয়েছে, যদিও পশ্চিমাংশে, অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমিতে, তাদের সংখ্যা সর্বাধিক। এছাড়া দক্ষিণ আর্কট জেলা এবং পণ্ডিচেরীতে আর্তেজীয় কূপ ও দক্ষিণ আর্কট জেলায় নলকূপ থেকে জলসেচের ব্যবস্থা আছে।

জলসেচের সুযোগ থাকায় এখানে অনেক স্থানে বছরে দুটো ফসল উৎপাদিত হয়। ওড়িশার মহানদী বদ্বীপাঞ্চলে প্রায় অর্ধেক জমি দো-ফসলা।

উৎপাদিত ফসলের মধ্যে ধানের স্থান প্রথম। কোন কোন স্থানে মোট কর্ষিত জমির ৯০-৯৭ ভাগ ধান চাষে নিয়োজিত। উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব অংশে এবং সমভূমির মধ্যভাগের কিছু অংশে ধান অদ্বিতীয় ফসল। ওড়িশা সমভূমির প্রধান বাণিজ্যিক ফসল পাট। মহানদী বদ্বীপের ৫ শতাংশ জমিতে পাট চাষ হয়। ফসলের মধ্যে ধানের পরেই স্থান ডালের। ধানের মতই উপকূলীয় ওড়িশার সর্বত্র নানারকম ডাল উৎপাদিত হয়। অন্যান্য ফসলের মধ্যে ইক্ষু এবং তৈলবীজ বিশেষভাবে উল্লেখ-

যোগ্য। অন্ধ্রের বদ্বীপাঞ্চলেও ধানের অনরূপ প্রাধান্য দেখা যায়। উপকূলীয় জেলাগুলিতে ডাল দ্বিতীয় প্রধান ফসল। এখানকার প্রধান বাণিজ্যিক ফসলের মধ্যে তামাক, তৈলবীজ এবং চীনাবাদামের স্থান খুবই গুরুত্বপর্ণ। উপকূলীয় অঞ্চলের প্রায় সর্বত্র তৈলবীজের চাষ হয়। কৃষ্ণা, গুন্টুর, বিশাখাপটনম এবং শ্রীকাকুলাম জেলায় চীনাবাদাম জন্মায়। গুন্টুর জেলায় এ রাজ্যের অধিকাংশ তামাক উৎপাদিত হয়। পূর্ব গোদাবরী জেলায় নারকোল এবং গুন্টুর ও নেলোর ভিন্ন অন্যান্য উপকূল-বর্তী জেলায় ইক্ষুর চাষ হয়। কাবেরী বদ্বীপেও ইক্ষু জন্মে থাকে। তামিলনাড়ুর বদ্বীপাঞ্চল ও নদী উপত্যকায় ধান ফসল হিসেবে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। পশ্চিম দিকে বৃষ্টি-পাত কমে আসার ফলে ধানের প্রাধান্য কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। ঐ সব স্থানে ধানের পাশাপাশি কলা, ইক্ষু এবং সুপারির চাষ হয়। উপকূলভাগের সর্বত্র ডাল ও ছোলা দ্বিতীয় ফসল হিসেবে উৎপাদিত হয়। সমগ্র উপকূলভাগে নারকোলের চাষ হয়। তামিলনাড়ুর সর্ববৃহৎ বাণিজ্যিক ফসল চীনাবাদাম প্রধানত উত্তর ও দক্ষিণ আর্কট জেলায় এবং তিরুভানামালাই তালুকে জন্মায়। রামনাথপুরম ও মাদুরা জেলার কৃষ্ণ-মৃত্তিকা অঞ্চলে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক ফসল তুলো উৎপাদিত হয়। অন্যান্য ফসলের মধ্যে কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চলের বাজরা এবং রক্তমৃত্তিকা অঞ্চলের রাগী উল্লেখযোগ্য।

খনিজ সম্পদ ও শিল্প: ভারতের অন্যান্য সমভূমি অঞ্চলের ন্যায় পূর্ব উপকূলীয় সমভূমিতে খনিজ সম্পদের অভাব খুবই প্রকট। ওড়িশা সমভূমিতে চুনাপাথর পাওয়া যায়। অন্ধ্র সমভূমির চুনাপাথর, গ্রাফাইট, তামিলনাড়ু সমভূমির অন্তর্গত নেইভেলীর লিগনাইট কয়লা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

খনিজ সম্পদের অভাব সত্ত্বেও উপকূলীয় অঞ্চল শিল্প প্রসারে যথেষ্ট অগ্রসর। সমৃদ্ধ কৃষিব্যবস্থা, নানারকম শিল্পোপযোগী ফসল, সস্তা শ্রমিক, যোগাযোগের সুবন্দোবস্ত ইত্যাদি শিল্প-গঠনে বিশেষ সহায়ক হয়েছে। এখানকার শিল্প মূলত কৃষিভিত্তিক যদিও পৌরায়ণ (Urbanization) এবং ভৌগোলিক অবস্থানের সুযোগ নিয়ে কৃষি-বহির্ভূত শিল্পও কিছু কিছু গড়ে উঠেছে। মোটামুটিভাবে বড় বড় শহর ও নগরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠাতে শিল্পগুলির ভৌগোলিক বন্টন অনেকটা বিচ্ছিন্ন প্রকৃতির।

ওড়িশা সমভূমি তথা ওড়িশা রাজ্যের সর্বাপেক্ষা বড় শিল্পকেন্দ্র কটক। এখনে সিমেন্ট শিল্প, রেফ্রিজারেটর শিল্প, চীনামাটি ও কাচ শিল্প এবং লেসের ও সোনা ও রূপোর কাজ বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। বহরমপুর এবং পুরী অন্য দুটি শিল্পকেন্দ্র। কৃষি-ভিত্তিক শিল্পের মধ্যে চাল শিল্প সর্ববৃহৎ। এটি সমভূমির সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। এছাড়া এখানকার তাঁতশিল্প, পুরীর মোষের শিঙের তৈরি নানা সামগ্রী, শঙ্খ ও ঝিনুকের সৌখীন দ্রব্যাদি, চিল্কা হ্রদ অঞ্চলের মৎস্য শিল্প উল্লেখযোগ্য।

অন্ধ্র সমভূমির শিল্পসমূহ বিশাখাপটনম থেকে দক্ষিণে গোদাবরী নদীতীরে অবস্থিত রাজামুন্দ্রী পর্যন্ত স্থানটির মধ্যে প্রধানত কেন্দ্রীভূত। বিশাখাপটনম সর্বাপেক্ষা বৃহৎ শিল্পকেন্দ্র। এখানে জাহাজ শিল্প, নানারকম আনুষঙ্গিক ধাতু ও কারিগরি শিল্প, খনিজ তেল শোধনাগার ও অ্যালুমিনিয়ম শিল্প আছে। রাজামুন্দ্রী অ্যালুমিনিয়ম শিল্পের সর্ববৃহৎ কেন্দ্র। এখানকার পিতল শিল্পও নামকরা। শ্রীকাকুলামে ধাতু
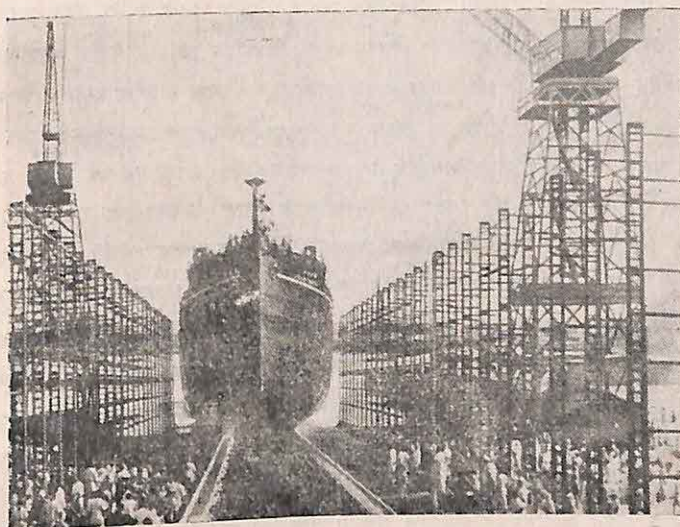
বিশাখাপটনমে জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র

শিল্প, কাকিনাড়ায় পিতলশিল্প ও কার্পাস শিল্প, বিজয়ওয়াড়া ও তাড়েপল্লীতে সিমেন্ট শিল্প, পূর্ব ও পশ্চিম গোদাবরী জেলা এবং গুন্টুর জেলার বিভিন্ন স্থানে চীনামাটি শিল্প ইত্যাদি গড়ে উঠেছে। মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের মধ্যে চালশিল্প এবং ভোজ্য তেল শিল্প বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে এবং এগুলি ছোট-বড় সব শহরেই দেখা যায়।

তামিলনাড়ু সমভূমির প্রধান শিল্পগুলি মাদ্রাজ, নেইভেলী, তিরুচিরাপল্লী, মাদুরা ও টিউটিকোরীন শহরে কেন্দ্রীভূত এবং তুলনামূলকভাবে ওড়িশা ও অন্ধ্র অপেক্ষা উন্নততর। মাদ্রাজ ও তার আশেপাশে মোটরগাড়ি শিল্প, স্কুটার শিল্প, ট্রাক শিল্প, প্যারাম্বুরে এশিয়ার বৃহত্তম রেলবোগি শিল্প, রাসায়নিক শিল্প, ডাক্তারী যন্ত্রপাতি শিল্প, দেশলাই শিল্প ইত্যাদি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নেইভেলীর রাসায়নিক সার ও রাসায়নিক শিল্প, তিরুচিরাপল্লীর কারিগরি শিল্প, টিউটিকোরীনের রাসায়নিক শিল্প, মাদুরার কার্পাস শিল্প বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছে। তিরুচিরাপল্লী, রামনাথপুরম ও তিরুনেল-

ভেলীতে সিমেন্ট কারখানা আছে। কাঞ্চীপুরম ও রামনাথপুরমের তাঁতশিল্প ভুবন-বিখ্যাত। কাঞ্চীপুরমের তাঁতে তৈরি রেশমের শাড়ি, মাদ্রাজ ও মাদুরার তাঁতজাত সূতীর সাড়ি, লুঙ্গি, বিছানার চাদর ইত্যাদি সারা ভারতে বাজার পেয়েছে।

যোগাযোগ ব্যবস্থা: এই অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই উন্নত। উপকূলীয় সমভূমির উত্তর-দক্ষিণ বিস্তারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এখানকার রেলপথ ও সড়কপথ উত্তর থেকে দক্ষিণে বিস্তৃত। কলকাতা থেকে জাতীয় সড়ক কটক, বিশাখাপটনম ও বিজয়ওয়াড়া হয়ে মাদ্রাজ এবং সেখান থেকে তিরুচিরাপল্লী ও মাদুরা হয়ে কেপ কমোরীন পর্যন্ত সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করেছে। বিভিন্ন রাজ্যের অন্তর্গত উপকূল অঞ্চলে শহর ও নগরগুলি আবার রাজ্য ও জেলা সড়কের দ্বারা স্থায়ীভাবে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। এইভাবে সমগ্র সমভূমি অঞ্চলে সড়কপথের অপূর্ব সমন্বয় সাধন সম্ভব হয়েছে। সড়কপথের মত রেলপথও বিশেষভাবে উন্নত। কলকাতা থেকে মাদ্রাজ এবং তারও দক্ষিণে মাদুরা হয়ে তিরুনেলভেলী এবং তিরাচেন্দুর পর্যন্ত রেলপথ আছে। প্রতিটি রাজ্যে এই রেলপথের শাখা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানের মধ্যে সংযোগ প্রতিষ্ঠা করেছে। সমুদ্রপথে মাদ্রাজ ও কলকাতার মধ্যে উপকূলীয় জাহাজ চলাচল করে। উপকূলের অনেকগুলি বিখ্যাত বন্দর জাহাজ চলাচলের পক্ষে বিশেষভাবে উপযুক্ত। যেমন মাদ্রাজ, বিশাখাপটনম, পণ্ডিচেরী, পারাদীপ ইত্যাদি। কটক জেলাতে নদীপথে যাতায়াত ব্যবস্থা চালু আছে। মাদ্রাজ একটি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর। মাদুরা এবং তিরুচিরাপল্লী অন্তর্দেশীয় বিমান বন্দর।

বসতি, শহর ও নগর: সমভূমি অঞ্চলে প্রায় ৮০ শতাংশ অধিবাসী গ্রাম্যজীবন যাপন করে। সাধারণত বদ্বীপাঞ্চল ও নদী উপত্যকায় গ্রামগুলি আয়তনে বড়। পশ্চিম দিকে বৃষ্টিপাতের স্বল্পতা ও জলসেচের অভাবের ফলে গ্রামের আয়তন ছোট হয়ে এসেছে। স্থলপথ ও নদীর দুধারে বসতিগুলি রেখাকৃতি। উপকূলভাগে জমি নিচু বলে মাটি কেটে স্থানে স্থানে ভরাট করে অপেক্ষাকৃত উঁচু ডাঙা-জমিতে বসতিগুলি গড়ে উঠেছে। এই কারণে প্রতি গৃহের সংলগ্ন একটি পুকুর দেখা যায়। দক্ষিণাঞ্চলে কৃত্রিম জলাধার, কূপ বা সেচখালকে কেন্দ্র করে ঘন-সন্নিবিষ্ট বৃহদায়তন বসতির সৃষ্টি হয়েছে। অর্ধ-চন্দ্রাকৃতি কৃত্রিম জলাধারের বাঁধকে কেন্দ্র করে একের পর এক বসতি মাদুরা-রামনাথপুরম অঞ্চলের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এখানে গৃহ নির্মাণে তালপাতা, নারকোল পাতা, এক ধরনের ঘাস ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। মাটির দেওয়াল এবং বাঁশের খুঁটি সর্বত্র দেখা যায়। দেওয়াল বাঁশের বেড়া বা গোটা বাঁশ দিয়েও তৈরি হয়। পাকা বাড়ির সংখ্যা কম। পাকা বাড়ির চাল টালি আচ্ছাদিত হয়ে থাকে।

কৃষিকার্যের অনুকূল পরিবেশ এবং উপকূলীয় অবস্থান পৌর বসতি সৃষ্টির সহায়তা করে এসেছে। আর্যদের সময় থেকে এখানে নগর স্থাপিত হবার দৃষ্টান্ত দেখা যায়।
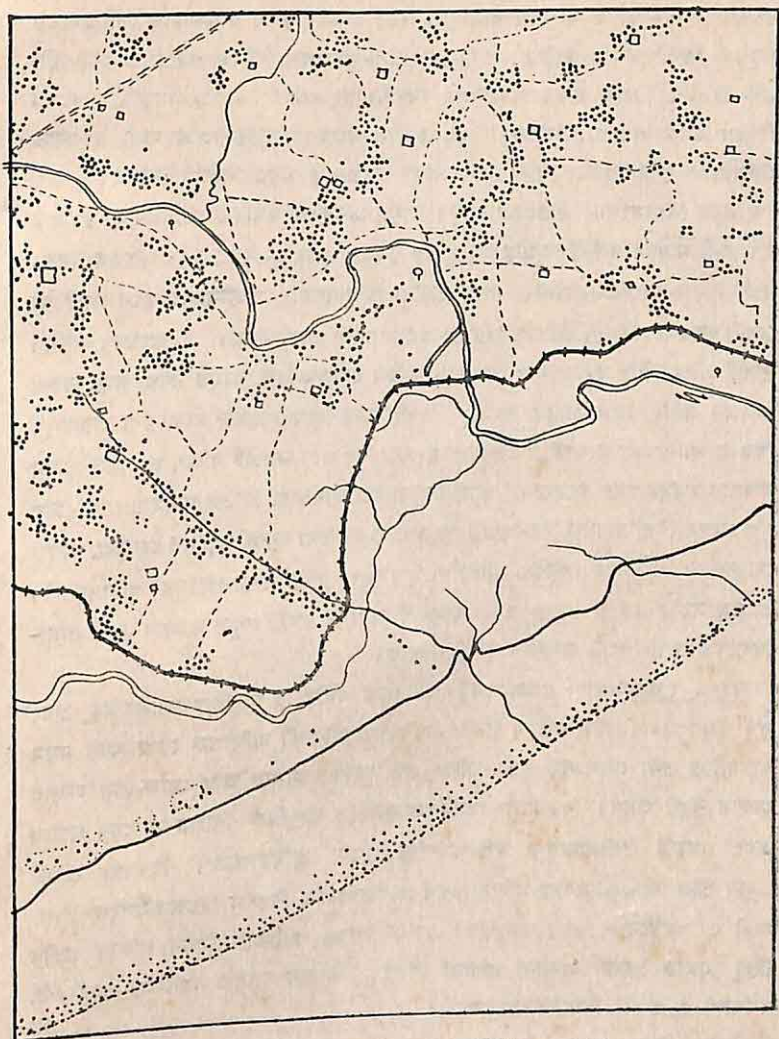
ওড়িশা উপকূলে রেখাকৃতি ও ঘন-বিক্ষিপ্ত বসতি

বর্তমানে তার গতি দিনদিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও দীর্ঘ সমভূমি অঞ্চলের সর্বত্র পৌরায়ণের মাত্রা একরকম নয়। তামিলনাড়ুর সমুদ্র উপকূলে সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক শহর ও নগর কেন্দ্রীভূত। এখানে মাদ্রাজ থেকে দক্ষিণে নাগাপট্টিনম পর্যন্ত এবং পশ্চিমে তিরুচিরাপল্লী ও মাদুরাকে কেন্দ্র করে অসংখ্য পৌরবসতি (Urban centre) জন্মলাভ করেছে। অন্ধ্রের সমুদ্র উপকূলে বিশাখা-

পটনম, কাকিনাড়া ও পশ্চিমে রাজামুন্দ্রী এবং দক্ষিণে কৃষ্ণা বদ্বীপাঞ্চলে পৌরবসতির অনুরূপ কেন্দ্রীভবনতা ঘটেছে। ওড়িশায় কটক-ভুবনেশ্বর অঞ্চলে এই ধরনের কেন্দ্রীভবনতা লক্ষ্য করা যায়। এই সব কেন্দ্রীভবন অঞ্চল ছাড়াও সমভুমি অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য ছোট-বড় শহর ছড়িয়ে আছে। বৃষ্টিপাতের মাত্রা, মৃত্তিকার উর্বরতা ও কৃষি-সমৃদ্ধির মাত্রা পৌরবসতির সংখ্যা ও ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণ করেছে।

মাদ্রাজ (জনসংখ্যা: ২,৪৬৯,৪৪৯): সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত তামিলনাড়ু রাজ্যের রাজধানী মাদ্রাজ পূর্ব উপকূলীয় সমভুমির বৃহত্তম এবং ভারতের চতুর্থ বৃহত্তম নগর। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ১৬৪০ সালে স্থানীয় হিন্দু রাজার সাহায্যে এইস্থানে সেন্টজর্জ ফোর্ট নামে একটি দুর্গ প্রতিষ্ঠা মারফৎ এই নগরীর পত্তন করে। ইংরেজদের আমলে স্থানটি ধীরে ধীরে প্রশাসনিক কেন্দ্র ও কৃত্রিম পোতাশ্রয়কে আশ্রয় করে বৃহৎ বন্দর হিসেবে সমৃদ্ধি লাভ করতে থাকে। স্বাধীনোত্তর যুগে মাদ্রাজে নানারকম গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ও বাণিজ্যের যথেষ্ট প্রসার ঘটেছে এবং বর্তমানে নগরটি দক্ষিণ ভারতের প্রধান বন্দরের মর্যাদা লাভ করেছে। রাজ্য সরকারের কার্যালয়, বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মূল সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়, অনেকগুলি কলেজ ও অসংখ্য স্কুল, বড় বড় হোটেল, অজস্র দোকানপাট, চলচ্চিত্র স্টুডিও ইত্যাদি মাদ্রাজের নানা ক্রিয়াকলাপের পরিচয়বাহী। তামিল সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র এই মহানগরী অসংখ্য পার্ক, সবুজ ময়দান এবং সমুদ্র-সৈকতের জন্য বিরাট আকর্ষণ সৃষ্টি করেছে।

মাদুরা (জনসংখ্যা: ৫৪৯,১১৪): ভায়গায় নদীতীরে অবস্থিত তামিলনাড়ু এবং পূর্ব উপকূলের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগর। বিখ্যাত মীনাক্ষী মন্দিরকে কেন্দ্র করে নবম শতাব্দীতে এই নগর গড়ে ওঠে, যদিও এর সূত্রপাত হয়েছে আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে। বর্তমানে এখানে অনেকগুলি আধুনিক শিল্পের সমাবেশ ঘটেছে এবং নগরটি তামিলনাড়ুর দক্ষিণাঞ্চলের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। হিন্দুদের একটি প্রধান তীর্থ মীনাক্ষীদেবীর মন্দির অপূর্ব স্থাপত্যকলার নিদর্শন হিসেবে অসংখ্য তীর্থযাত্রী ও পর্যটকের প্রধান আকর্ষণ। এছাড়া আরও কয়েকটি প্রাচীন মন্দির, প্রাচীন হিন্দু রাজার প্রাসাদ অন্যান্য দ্রষ্টব্য বিষয়। এখানে অনেক হোটেল, রেস্টুরেন্ট, ধর্মশালা ও একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে।

বিশাখাপটনম (জনসংখ্যা: ৩৫২,৫০৪): অন্ধ্র উপকূলে অবস্থিত বিশাখাপটনম অন্ধ্ররাজ্যের বৃহত্তম নগর এবং সমগ্র উপকূলের নগরের মধ্যে এই স্থান তৃতীয়। স্বাভাবিক পোতাশ্রয়কে কেন্দ্র করে নগরটি অন্ধ্রের প্রধান শিল্পকেন্দ্র ও বন্দর রূপে গড়ে উঠেছে। এখানকার জাহাজশিল্প ভারতের মধ্যে বৃহত্তম। একাদশ শতাব্দীতে এই নগরীর পত্তন হয়। নানারকম বৃহৎ শিল্প ও অসংখ্য মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের সমাবেশ ছাড়াও এখানে নানারকম সরকারী অফিস, হোটেল ইত্যাদি এবং একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে।

পণ্ডিচেরী (জনসংখ্যা : ৯০,৬৩৭) : সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত কেন্দ্রীয় শাসিত পণ্ডিচেরী রাজ্যের রাজধানী। গৌতম বুদ্ধের সময়ে এই নগরের অস্তিত্ব ছিল। এর প্রাচীন নাম 'পদুকা' এবং 'আরিকামেদু'। প্রশাসনিক কেন্দ্র ব্যতীত পণ্ডিচেরীর আসল পরিচয় ঋষি অরবিন্দের আশ্রমের জন্যে। প্রতি বছর আশ্রমের আকর্ষণে অগণিত দেশী-বিদেশী তীর্থযাত্রী ও পর্যটকের ভীড় হয়। পণ্ডিচেরীর কিছু দূরে আশ্রমের তত্ত্বাবধানে 'অরোভিল' নামে এক 'আন্তর্জাতিক শহরের' নির্মাণ কার্য চলছে।

ওড়িশার সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত **পুরী** (জনসংখ্যা : ৭২৬৭৪) হিন্দুদের একটি প্রধান তীর্থ ও স্বাস্থ্যনিবাস। প্রাচীন নগর হিসেবে কাঞ্চীপুরমেরও খ্যাতি আছে। সমভূমি অঞ্চলের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নগরের মধ্যে তিরুচিরাপল্লী, বিজয়ওয়াড়া, গুন্টুর, রাজামুন্দ্রী, কাকিনাড়া, বহরমপুর, ভুবনেশ্বর ইত্যাদির নাম করা যেতে পারে। তামিলনাড়ুর মহাবলীপুরম (বা মামল্লপুরম) এবং ওড়িশার কোণারকের মন্দিরভাস্কর্য পৃথিবীবিখ্যাত।

দশম অধ্যায়

পশ্চিম উপকূলীয় সমভূমি

ভারতের পশ্চিম উপকূলভাগে পূর্ব উপকূলের অনুরূপ, কিন্তু অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ, আর একটি সমভূমি বর্তমান। পশ্চিমঘাট পর্বতের পশ্চিমে ১৫০ মি সমোন্নতি রেখা থেকে আরম্ভ হয়ে এই সমভূমি আরবসাগর উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত। তিশ থেকে আশি কিলোমিটার প্রশস্ত এবং প্রায় ১৪০০ কি দীর্ঘ সমভূমির মোট আয়তন প্রায় ৬৪,২৮৪ ব কি।

অবস্থান: মহারাষ্ট্র, গোয়া, মহীশূর এবং কেরালা রাজ্যের উপকূলভাগকে নিয়ে সমভূমি অঞ্চল গঠিত। প্রাচীনকাল থেকে মহারাষ্ট্র ও গোয়া উপকূল 'কঙ্কন', মহীশূর উপকূল 'কানাড়া' বা 'কর্ণাটক' এবং কেরালা উপকূল 'মালাবার' উপকূল নামে পরিচিত। উত্তরে উপকূলীয় সমভূমি ধীরে ধীরে গুজরাট সমভূমির সঙ্গে মিশে গেছে। দক্ষিণে তামিলনাড়ুর কন্যাকুমারী জেলা এই উপকূলীয় সমভূমির অন্তর্গত। (মানচিত্র ২৬)।

ভূপ্রকৃতি ও নদনদী: বিস্তীর্ণ সমভূমির ভূপ্রাকৃতিক গঠন বৈশিষ্ট্যমূলক। পূর্ব দিকে সমান্তরালভাবে প্রসারিত পশ্চিমঘাট ৭৬০-১২২০ মি উঁচু খাড়া প্রাচীরের সৃষ্টি করেছে। এই প্রাচীরের স্থানে স্থানে কয়েকটি ফাঁক আছে। স্থানীয় ভাষায় তাদের 'ঘাট' বলা হয়। এই সব ঘাট পশ্চিম উপকূলের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের যোগাযোগ স্থাপন করেছে। বোম্বাইয়ের নিকটবর্তী থলঘাট, ভোরঘাট, দক্ষিণে পালঘাট ও সেনকোট্টা কেরালা ও তামিলনাড়ুর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। পশ্চিমঘাট পর্বতের ছোট ছোট বাহু বা শাখা কোথাও কোথাও সমভূমি অঞ্চলে ঢুকে পড়ে প্রায় তটভাগ পর্যন্ত প্রসারিত। কঙ্কন উপকূলের দক্ষিণাংশে এই ধরনের ছোট ছোট পাহাড় এবং ক্ষয়প্রাপ্ত মালভূমি বন্ধুর ভূপ্রকৃতির সৃষ্টি করেছে। কর্ণাটক উপকূলের উত্তরাংশেও এই রকম ছোট পাহাড় (৬০০ মি) প্রায় তটরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত। মালাবার উপকূলের পূর্বাংশে ল্যাটেরাইট মালভূমি এবং ত্রিবান্দ্রমের নিকটে তটরেখা পর্যন্ত প্রসারিত পাহাড় উপকূলীয় সমভূমিকে বন্ধুর এবং সংকীর্ণ করে তুলেছে। পশ্চিম উপকূলের তটরেখা অত্যন্ত ভগ্ন প্রকৃতির এবং অসংখ্য উপহ্রদ ও কয়েকটি দ্বীপের জন্ম দিয়েছে। বোম্বাই মহানগর এইরকম একটি দ্বীপে অবস্থিত। দক্ষিণ দিকে মালাবার উপকূলে উপহ্রদগুলি আয়তনে বৃহত্তর এবং এছাড়া এখানে বিরাটাকৃতি পশ্চাদবর্তী হ্রদ (backwaters) দেখা যায়। পশ্চাদবর্তী হ্রদ সমুদ্রের পরিত্যক্ত
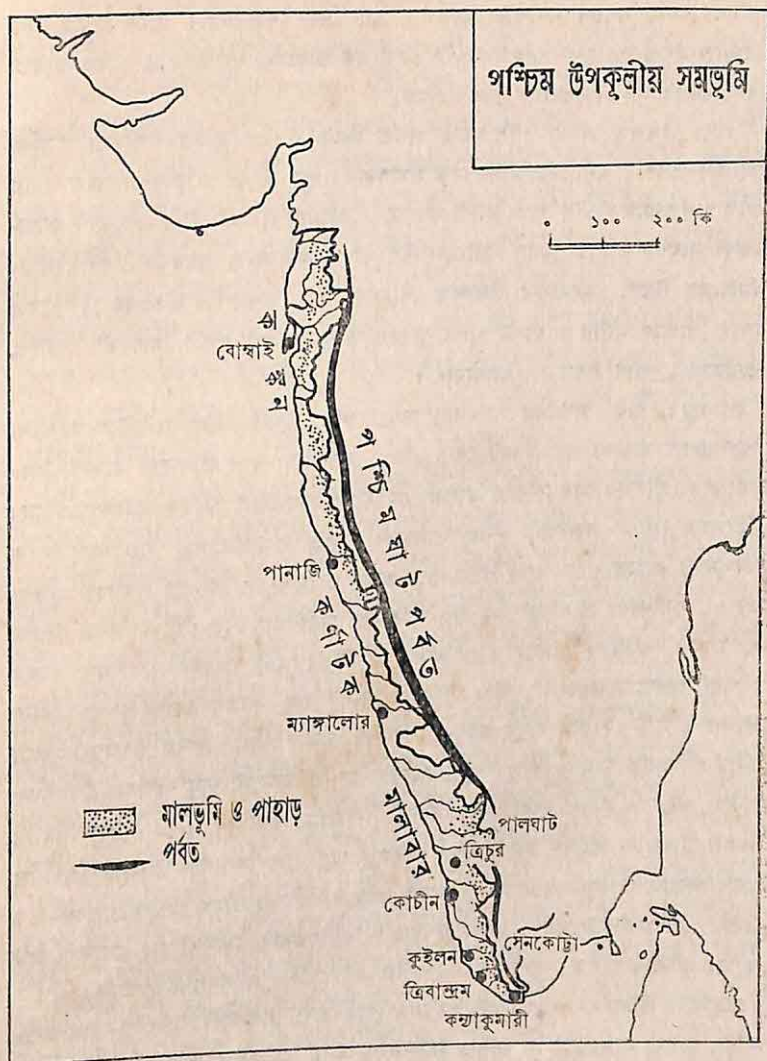
মানচিত্র ২৬

অংশবিশেষ। সৈকতভূমি ওপরে উঠে যাওয়াতে সমুদ্রের অপেক্ষাকৃত অগভীর কিছু অংশ স্থলভূমির অন্তর্ভুক্ত হয়ে এই ধরনের হ্রদের জন্ম দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মালাবার উপকূল উত্থানশীল (emergent) পর্যায়ের এবং কর্ণাটক ও কঙ্কন উপকূল নিমজ্জমান (submerged) প্রকৃতির। বেলাভূমি, সারি সারি বালিয়াড়ি এবং কর্দমাক্ত নিম্ন সমতলের সমন্বয়ে সৈকতভূমি গঠিত। সমভূমি গঠনে নদী-বদ্বীপের

ভূমিকা নেই, কারণ নদীগুলি আকারে ছোট এবং খরস্রোতা। তবে অজস্র নদী বিধৌত সমভূমির সর্বত্র এই নদীগুলি ছোট-বড় উপত্যকা সৃষ্টি করে ভূমির বন্ধুরতা এবং রুক্ষতাকে অনেকাংশে হ্রাস করেছে।

সমগ্র উপকূল অঞ্চল পশ্চিমঘাট পর্বত থেকে উৎপন্ন অজস্র নদীদ্বারা অসংখ্য ভাগে বিভক্ত। নদীগুলি পরস্পরের সমান্তরাল; পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রবাহিত হবার পথে পর্বতগাত্রে গভীর খাত সৃষ্টি করেছে। অনেক ক্ষেত্রে নদী-খাতের ঢাল আগাগোড়া যথেষ্ট খাড়া। কোন নদী খুব দীর্ঘ নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য ৬০ কিলোমিটারের নিচে। মালাবার উপকূলে পেরিয়ার নদী দীর্ঘতম (২৩০ কি)। উত্তর থেকে দক্ষিণে নদীর মধ্যে বৈতরণী, উল্লাস, অম্বা, সাবিত্রী, কালী, সরাবতী, বেইপুর, ভারতপূজা, পাম্বা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

জলবায়ু: এই অঞ্চলের জলবায়ু সমভাবাপন্ন, অর্থাৎ শীত ও গ্রীষ্মের মধ্যে তাপমাত্রার পার্থক্য খব একটা বেশি নয়। সারা বছর ধরে তাপমাত্রা যথেষ্ট উর্ধ্বমানের। গ্রীষ্মকালের সর্বোচ্চ তাপাঙ্ক ৩২° সে ও শীতকালে সর্বনিম্ন তাপাঙ্ক ২১° সে। ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তাপমাত্রা কিছুটা কম থাকে। মার্চ মাস থেকে তাপমাত্রা বাড়তে থাকে এবং বৃষ্টি শুরু হবার আগে পর্যন্ত গ্রীষ্মের প্রখরতা অনুভূত হয়। বর্ষাকালে তাপমাত্রা কমলেও অতিরিক্ত আর্দ্রতার জন্য গরমের কষ্ট বিশেষ কমে না। এপ্রিল-মে মাসে প্রথম বর্ষণ শুরু হয়। এই বর্ষণের সঙ্গে আম পাকার সম্পর্ক থাকাতে একে mango shower বলে। জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বর্ষাকাল সূচিত হয়। সমগ্র উপকূল অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। প্রচুর জলকণা-সম্পৃক্ত মৌসুমী বায়ু পশ্চিমঘাট পর্বতের সুউচ্চ প্রাচীরে হঠাৎ বাধা পেয়ে উপকূল অঞ্চলে পরিচলন বৃষ্টি ঘটিয়ে থাকে। কঙ্কন উপকূলে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২৮০ সে, কর্ণাটক উপকূলে ৩১০ সে এবং কেরালা উপকূলে ২৪০ সে। আরও দক্ষিণে কন্যাকুমারীতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে ১০০ সেন্টিমিটারে এসে দাঁড়িয়েছে। অপসৃয়মান মৌসুমী বায়ু থেকেও এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয়। মালাবার উপকূলে এই বর্ষণের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য।

প্রাকৃতিক উদ্ভিদ: পশ্চিমঘাট পর্বতের ঢালে আর্দ্র পর্ণমোচী এবং ক্রান্তীয় চিরহরিৎ অরণ্য দেখা যায়। যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা কৃষিকার্যের জন্য নির্মূল হয়ে গেছে। সমভূমি অঞ্চলের নিয়ত প্লাবন ভূমি ও জলাভূমিতে জলজ উদ্ভিদ, বেলাভূমিতে নারকোল ও ঝাউগাছ, এবং পাহাড় ও মালভূমিতে কাঁটাগাছ ও বাঁশ প্রধান উদ্ভিদ। এছাড়া সমভূমির সর্বত্র তালজাতীয় গাছ দেখা যায়। উত্তর কর্ণাটকের অরণ্যে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর সেগুন বৃক্ষ জন্মায়।

কৃষিকার্য: এই অঞ্চলের প্রধান উপজীবিকা কৃষিকার্য। কিন্তু অনুদার ভূপ্রকৃতির জন্য মোট ভূভাগের মাত্র ৪৪ শতাংশ কৃষিকার্যে নিয়োজিত। এখানকার মৃত্তিকা

নানা শ্রেণীর। সমভূমির উত্তরাংশের মৃত্তিকা পললজাতীয় এবং খুবই উর্বর। দক্ষিণ-দিকে নদীউপত্যকা ভিন্ন অন্যত্র পলল মৃত্তিকা দেখা যায় না। বালুকাময় সৈকত-ভূমির মৃত্তিকা উর্বর নয়। উত্তর কঙ্কনের কিছু অংশে কৃষ্ণ মৃত্তিকা দেখা যায়। এই মৃত্তিকা অত্যন্ত উর্বর। মালাবার উপকূলের পূর্বাংশে মালভূমি অঞ্চলে মৃত্তিকা ল্যাটে-রাইট বা রক্তমৃত্তিকা। কঙ্কর ও মোটাবালি সমন্বিত এই মৃত্তিকায় অম্লের পরিমাণ বেশি হওয়াতে কৃষিকার্যের পক্ষে খুব উপযোগী নয়। উপকূলীয় পশ্চাদবর্তী হ্রদের পূর্ব দিকে কর্দমাক্ত জলা মৃত্তিকা (peaty soil) অনুর্বর প্রকৃতির।

কৃষিযোগ্য ভূমির অভাব এখানে জমির ওপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করেছে। কেরালার অন্তর্গত সমভূমি অঞ্চলে অধিকাংশ জমি কৃষিকার্যে নিয়োজিত। উত্তরদিকে কর্ণাটক উপকূলে কর্ষিত ভূমির পরিমাণ সর্বাপেক্ষা কম। কঙ্কনে মোট ভূভাগের এক-তৃতীয়াংশ জমিতে চাষ হয়ে থাকে।

অধিক বৃষ্টিপাত হওয়া সত্ত্বেও ফসল উৎপাদনের পক্ষে তা সময়োপযোগী এবং উপযুক্ত পরিমাণ নয়। সেই কারণে জলসেচের প্রয়োজন রয়েছে। কঙ্কন ও কর্ণাটক সমভূমিতে প্রধানত খাল-সেচ প্রচলিত। এছাড়া ডোঙার সাহায্যে উত্তোলিত প্রথায় (Lift Irrigation) এবং কূপ থেকে অল্প পরিমাণ জমিতে জলসেচ করা হয়। মালাবার ও কেরালা সমভূমিতে ১১$\frac{১}{২}$ লক্ষ হেক্টর জমিতে খাল, কৃত্রিম জলাধার, কূপ ইত্যাদি দ্বারা জলসেচের ব্যবস্থা আছে।

ধান এই অঞ্চলের প্রধান ফসল। মোট কর্ষিত ভূমির প্রায় অর্ধেক জমিতে ধান উৎপাদিত হয়। মালাবার ও কর্ণাটক উপকূলে জমির একটি বৃহৎ অংশ নারকোল এবং উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কলা, কাজুবাদাম ও সুপারী উৎপাদনে নিয়োজিত। কর্ণাটকের আর দুটি উল্লেখযোগ্য ফসল হল আদা এবং লঙ্কা। কঙ্কন উপকলের আম বিখ্যাত। উপকূল অঞ্চলের অন্যান্য ফসলের মধ্যে রাগী, সাগু বা ট্যাপিয়কা, মিষ্টি আলু, ডাল, গোলমরিচ ও তৈলবীজ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। জীবিকা হিসেবে কৃষিকার্যের পরেই মৎস্য শিকার। উপকূলভাগের অধি-বাসীদের একটি বৃহৎ অংশ মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। উত্তর থেকে দক্ষিণ সমুদ্রের ধারে ধারে অসংখ্য মৎস্যজীবীদের গ্রাম গড়ে উঠেছে।

খনিজ সম্পদ ও শিল্প: গোয়াতে লৌহ ও ম্যাঙ্গানীজ পাওয়া যায়। গোয়া থেকে উত্তোলিত আকরিক লৌহ সম্প্রতি জাপানে রপ্তানি করা হচ্ছে।

সমভূমি অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে শিল্প-প্রসার সম্ভব হয়নি। একমাত্র বোম্বাই ভিন্ন অন্য কোথাও বৃহৎ শিল্প নেই। শিল্প প্রতিষ্ঠায় ভারতে বোম্বাইয়ের স্থান সর্বাগ্রে। আর কোন নগরীতে এত বিরাট সংখ্যক বৃহৎ এবং মাঝারি শিল্পের সমাবেশ দেখা যায় না। পশ্চিমঘাট পর্বতে অবস্থিত বিভিন্ন জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং ট্রম্বে ও তারাপুরে পরমাণবিক শক্তিকেন্দ্র থেকে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যুৎ সরবরাহ

এবং ভারতের তুলো অঞ্চল ও খনিজ অঞ্চলের সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে গড়ে ওঠা সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে এই শিল্প ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। শিল্পের মধ্যে বয়নশিল্প, রাসায়নিক শিল্প, ভারী যন্ত্রপাতি ও কারিগরি শিল্প এবং কৃত্রিম রেশম শিল্প সর্বপ্রধান। এখানকার বয়নশিল্প ভারতে সর্ববৃহৎ। বোম্বাই ভিন্ন কঙ্কন উপকূলের অন্যান্য স্থানে ভারী শিল্প আর নেই। বেসিনের লবণ শিল্প বিখ্যাত। এছাড়া উপকূলের অনেক স্থানে মৎস্য শিল্প, চাল শিল্প, নৌকো শিল্প ইত্যাদি গড়ে উঠেছে। কর্ণাটক উপকূলে ম্যাঙ্গালোর একমাত্র গুরুত্বপর্ণ শিল্পকেন্দ্র। এখানে কাজুবাদাম ও কফি শিল্প, ধাতু শিল্প, কারিগরি শিল্প, রাসায়নিক ও সাবান শিল্প, চাল এবং ভোজ্য তেল শিল্প ইত্যাদি আছে। তুলনামূলকভাবে কেরালার শিল্প এখানে প্রধানত কুটির শিল্প পর্যায়ের। কৃষিভিত্তিক শিল্পের মধ্যে কাজুবাদাম শিল্পের স্থান প্রথম এবং তা কুইলন জেলায় কেন্দ্রীভূত। এখানকার মৎস্যশিল্প অত্যন্ত গুরুত্বপর্ণ। কাজুবাদামের মত টিনে সংরক্ষিত মাছ ও ব্যাঙের ঠ্যাং বিদেশে চালান যায়। কোজিকোডে, এরনাকুলাম ও কুইলন জেলায় ছোট চিংড়ী, গলদা চিংড়ী, সারডিন এবং ব্যাঙের ঠ্যাং সংরক্ষণ শিল্প প্রসার লাভ করেছে। কান্নানোড়ে চা শিল্প, ত্রিচুরে যানবাহন শিল্প, নারকোল ছোবড়া ও দড়ি শিল্প, এর্নাকুলামে নারকোল ছোবড়া ও দড়ি শিল্প, কাজুবাদাম শিল্প, প্লাস্টিক শিল্প, রবার ও রাসায়নিক শিল্প এবং ঐ জেলার আলওয়েতে অ্যালুমিনিয়ম শিল্প অবস্থিত। কোট্টায়ামে সিমেন্ট শিল্প, যানবাহন শিল্প এবং কুইলন ও ত্রিবান্দ্রমে রবার শিল্প, কাগজ শিল্প, চীনামাটি শিল্প গুরুত্ব অর্জন করেছে।

যোগাযোগ ব্যবস্থা : বন্ধুর ভূপ্রকৃতি এবং অজস্র পার্বত্য নদীর পূর্ব-পশ্চিম প্রবাহ সমভূমির উত্তর থেকে দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত সরাসরি স্থলপথ নির্মাণের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই কারণে পূর্ব উপকূলীয় সমভূমির মত এই অঞ্চলের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারেনি। একমাত্র বোম্বাই, ম্যাঙ্গালোর ও কেরালা সমভূমি ব্যতীত অধিকাংশ স্থানে যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই দুর্বল। বোম্বাই তিনটি রেলপথের মাধ্যমে ভারতের বিভিন্ন স্থানের সঙ্গে যুক্ত। পূর্বের মালভূমি থেকে একটি রেলপথ গোয়ার মারগাঁও পর্যন্ত প্রসারিত। ম্যাঙ্গালোর থেকে একটি রেলপথ দক্ষিণ দিকে কেরালার উপকূল ধরে অগ্রসর হয়ে পালঘাট দিয়ে পূর্ব দিকে প্রসারিত হয়েছে। ঐ রেলপথের আর একটি শাখা দক্ষিণে কুইলন হয়ে ত্রিবান্দ্রমে গেছে। কুইলন থেকে রেলপথের অন্য একটি শাখা দক্ষিণে কুইলন হয়ে ত্রিবান্দ্রমে গেছে। কুইলন থেকে রেলপথের অন্য একটি শাখা পূর্ব দিকে সেনকোট্টা ফাঁক দিয়ে পূর্ব উপকূল পর্যন্ত প্রসারিত। রেলপথের মত এই স্থানগুলিতে সড়কপথেও যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। বোম্বাই থেকে দক্ষিণ দিকে গোয়া পর্যন্ত পাকা সড়ক আছে। ম্যাঙ্গালোর থেকে সড়কপথে দক্ষিণ ভারতের অভ্যন্তরের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে। কেরালার এর্নাকুলম ও ত্রিবান্দ্রম অঞ্চলে সড়কপথের ঘনত্ব সর্বাধিক। এই

সড়কপথ পূর্ব দিকে দক্ষিণ ভারতের অভ্যন্তরভাগ ও দক্ষিণ উপকূল পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে।

বসতি, শহর ও নগর : এই অঞ্চলের প্রায় ৬৮ শতাংশ অধিবাসী গ্রামে বাস করে। পূর্ব উপকূলের ন্যায় ঘন বসতি এখানে একমাত্র নদী উপত্যকার উর্বর পলল মৃত্তিকা ভিন্ন অন্য কোথাও দেখা যায় না। গ্রামগুলি সাধারণত আয়তনে ছোট। তটরেখার নিকটে মৎস্যজীবীদের ছোট ছোট গ্রামে গৃহসমূহও নিম্নশ্রেণীর। বরং সে তুলনায় কেরালা সমভূমির গ্রাম আয়তনে অনেক বড়। ল্যাটেরাইট শিলা বা রক্তমৃত্তিকায় তৈরি মেঝে, টালি বা নারকোল পাতায় ছাওয়া এই অঞ্চলের বাড়িগুলি দেখতে খুবই সুন্দর।

পৌরায়ণের দিক থেকে পূর্ব উপকূলের সঙ্গে পশ্চিম উপকূলের বৈসাদৃশ্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মোট অধিবাসীর প্রায় ৩২ শতাংশ পৌরবাসী হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিম উপকূলে শহর ও নগরের সংখ্যা পূর্ব উপকূল অপেক্ষা অনেক কম। একমাত্র বোম্বাই মহানগরীতে আঞ্চলিক পৌর অধিবাসীদের প্রায় অর্ধেক ভীড় করেছে। এখানকার পৌরবসতি কোথাও খুব কেন্দ্রীভূত নয়। বোম্বাইয়ের নিকটবর্তী উপকূলভাগ ও কেরালা উপকূল ভিন্ন আর কোথাও পৌরবসতি বেশি সংখ্যায় গড়ে ওঠেনি।

বোম্বাই (জনসংখ্যা : ৫,৯৭০,৫৭৫) : বোম্বাই দ্বীপের আয়তন ৬৫ বর্গ কি। বর্তমানে বৃহত্তর বোম্বাই দ্বীপের সীমা ছাড়িয়ে উপকূলভাগে অনেকটা বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। বৃহত্তর বোম্বাই মহারাষ্ট্র রাজ্যের রাজধানী, ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগর, প্রধান শিল্পকেন্দ্র এবং শ্রেষ্ঠতম বন্দর। এখানকার স্বাভাবিক পোতাশ্রয় তুলনাহীন। ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে এই স্থানটি বৈবাহিক সূত্রে উপঢৌকন হিসেবে পর্তুগালের রাজার কাছ থেকে ইংলণ্ডের রাজার হাতে আসে এবং সেইদিন থেকে প্রকৃত বোম্বাইয়ের পত্তন হয়। উপকূলীয় অবস্থান এবং সমৃদ্ধ পশ্চাদভূমির কল্যাণে পরবর্তীকালে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বোম্বাইয়ের দ্রুত শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে থাকে এবং অনতি-কালের মধ্যে কলকাতার সমকক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। বর্তমানে শিল্প ও বহির্দেশীয় বাণি-জ্যের ক্ষেত্রে এই মহানগরী কলকাতাকেও ছাড়িয়ে গেছে। বিরাট সংখ্যক বৃহৎ, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের সমাবেশ, রাজ্য সরকার ও ভারত সরকারের অসংখ্য কার্যালয়, একটি সাধারণ ও আর একটি কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়, অনেক কলেজ, গণনাতীত স্কুল, অজস্র দোকানপাট, হোটেল, রেস্টুরেন্ট, সমুদ্র উপকূলস্থ 'ম্যারিন ড্রাইভ' বালুবেলার অপূর্ব শোভা মহানগরীকে দেশী ও বিদেশীদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

কোচীন (জনসংখ্যা : ৪৩৯,০৬৬) : কেরালা রাজ্যের বৃহত্তম এবং পশ্চিম উপকূলের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগর ও বন্দর। প্রাচীনকাল থেকে সমুদ্র উপকূলে অবস্থানের জন্য এই নগর বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে খ্যাত। ১৫০০ খৃষ্টাব্দে পর্তুগীজদের

আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এই বন্দরের গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়। বর্তমানে এখানে নানা-রকম শিল্পের সমাবেশ হয়েছে। এখানে কয়েকটি প্রাচীন গির্জা আছে। কোচীনের পশ্চাদরতী হ্রদ (backwaters) দেখার জন্য প্রচুর পর্যটকের ভীড় হয়। কোচীন জল ও স্থলপথে দক্ষিণ-ভারতের অন্যান্য স্থানের সঙ্গে যুক্ত। ত্রিবান্দ্রম (জনসংখ্যা : ৪০৯,৩২৭) : কেরালা রাজ্যের রাজধানী এবং একটি প্রধান শিল্প ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র। অদূরে থুম্বায় অবস্থিত মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র ত্রিবান্দ্রমের গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছে।

উপকূলীয় অঞ্চলের অন্যান্য শহর ও নগরের মধ্যে ম্যাঙ্গালোর, কালিকট, আলেপ্পী, কুইলন এবং গোয়ার রাজধানী পানাজি উল্লেখযোগ্য।